দৃষ্টিকোণ

বীথি ও আশুতোষ ঘোষকে

দাড়ি কামাবার জন্য ব্লেড কিনতে হলেও ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে পয়সা চাইতে হয়, আমার তখন এমন অবস্থা। কোনো রকমে এক পিঠের ভাড়া জোগাড় করে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে, ফেরার সময় ফেরৎ গাড়িভাড়া কারুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে বাধ্য হই। আমার বাড়ি থেকে বড়ো রাস্তায় বেরুবার জন্য দুটিমাত্র গলি পথ। দুটি গলির মুখেই দুটি সিগারেটের দোকানে প্রচুর ধার জমে যাওয়ায় এমন মুস্কিল হয় যে, যে-কোনো দিক দিয়ে বেরুতে গেলেই বিপদ। বাড়ির সামনে দিয়ে বেলুনওলা রং-বেরংয়ের অসংখ্য বেলুন নিয়ে যাচ্ছে, আমার পিসতুতো ভাইয়ের ছেলেটি আচমকা আবদার ধরে বসল কাকা, আমায় বেলুন কিনে দাও না। আমি শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিমর্ষ ভাব চেপে রেখে ওকে বললুম দূর পাগল। বেলুন কিনে কি হবে, ওতো যখন তখন ফেটে যায়, আমি তোকে পরে এরোপ্লেন কিনে দেব। এ রাস্তা দিয়ে এরোপ্লেন ফেরিওলা গেলে আমায় ডাকিস।

একটা ছোট ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করতুম, একদিন মালিকের কথায় হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেছিলুম একটা থাপ্পড়ে দাঁত ক'খানা খুলে দেব। ভদ্রভাবে যদি বলতে না পারেন, কথা বলতে আসবেন না আমার সঙ্গে। মালিক একটুও বিচলিত না হয়ে বলেছিল বেশ বেশ, এই রকম তেজি ছেলেই তো এখন দেশের পক্ষে দরকার। ভালো, ভালো। কিন্তু বাপু নিজের কর্মচারীর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে তো আমার পক্ষে কাজ চালানো মুস্কিল। এই ছোট জায়গায় আটকে থাকা ঠিক নয়, তুমি এর চেয়ে কোনো বড়ো জায়গায়, ভদ্র জায়গায় যে কাজে তোমার যোগ্যতার দাম পাবে—সে রকম জায়গা খুঁজে নাও। তোমায় আটকে রাখলে আমার পাপ হবে।

সেই দিন থেকেই আমার চাকরি যায়। তিন মাস পর্যন্ত আমার রাগ ও তেজ বেশ বজায় ছিল। তখনো চাকরি না পেয়ে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কানটা মুলে দিয়ে বলেছিলাম গোমুখ্যু ছাড়া কেউ কখনো মালিকের ওপর রাগ করে! চাকরি হচ্ছে ভগবান, হাজার দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা পেলেও ভগবানকে কখনো ত্যাগ করা যায় নাকি? সে কতটা সহ্য করতে পারে, ভগবান যেমন যাচাই করে দেখেন, চাকরিও তাই। মালিক না হয় আমাকে বলেছিল, একটা কথা ক'বার বলতে

হবে? গরু-ছাগলেও এর চেয়ে তাড়াতাড়ি বোঝে। কী এমন দোষ করেছিল, একথা বলে? এমনকি মালিকের বাড়িতে মেথর না এলে উনি যদি আমাকে পায়খানা সাফ করতেও বলতেন, তাও আমার হাসি মুখে করা উচিত ছিল। সবই তো পরীক্ষা।

যাই হোক, তখন আমি কোনো মেয়ের দিকে তাকাই না। ভালো করে কথা পর্যন্ত বলি না। পাছে প্রেম-টেম হয়ে যায়। প্রেম হলেই তো আবার পয়সার প্রশ্ন। বিকেলবেলা যদি হঠাৎ গরম কমে গিয়ে হঠাৎ হু হু করে মোলায়েম বাতাস দেয়, তখুনি আমি বাড়ির বন্ধ ঘরে ফিরে আসি। যদি আবার মন খারাপ হয়ে যায়। আগে বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হৈ করে সিনেমা দেখতে যেতুম, কে কেমন টিকিট কাটল খেয়ালই করিনি। কিন্তু এখন সিনেমার প্রসঙ্গ উঠলে আমি বলি, সিনেমা দেখলেই আমার মাথা ধরে, তোরা যা।

এমন অবস্থায় এক বন্ধু দয়াপরবশ হয়ে আমাকে একটি টিউশনি যোগাড় করে দিয়েছিল। একটি স্কুল ফাইনালের মেয়েকে গ্যারাণ্টি দিয়ে অঙ্কে পাশ করাতেই হবে, মাসিক পঞ্চাশ টাকা। সেই সময় আমার আরো দুরবস্থা হলো। পঞ্চাশ টাকার মূল্য আমার কাছে লক্ষ টাকার সমান, কিন্তু প্রথম মাসটা যে অসম্ভব দীর্ঘ। এক-একটা দিন যায় মরুভূমির এক মাইল পথের মতন। তা ছাড়া যেতে হয় নিউ আলিপুর, আমার বাড়ি থেকে বহু দূর। প্রত্যেক দিনের ভাড়া জোগাড় করার জন্য বহু আয়ুক্ষয় করতে হয়। তবু আমি দাঁতে দাঁত চেপে আগামী মাসের এক তারিখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মেয়েটি নির্বোধ কিন্তু সুন্দরী। নতুন তৈরি করা বাড়ির ব্যালকনিতে বসে বহুদূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়, রক্তিম ছায়াময় সন্ধেবেলা সেই সুরম্য হর্মের সদ্য যুবতী যখন আমার দিকে তাকিয়ে অকারণে হাসে আমি তখন অ্যালজ্যাব্রার ফর্মুলা ভাবি। অশ্বিনী দত্ত কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিযোগের চেয়ে অ্যালজ্যাব্রার শক্তিও কম নয়। বাড়িটাতে লোকজন খুব কম, মেয়ের বাবা মা প্রায়ই পার্টিতে যান, মেয়েটিকে যখন আমি পড়াই, ধারে কাছে একটিও লোক থাকে না। শাড়ির বদলে যেদিন মেয়েটি শালওয়ার পাঞ্জাবি পরে, সেদিন আমি ওর দিকে প্রায় চোখ তুলে তাকাই না। দু'বাহু তুলে ঐ স্বাস্থ্যবতী নির্বোধ কুমারী যখন আলস্য ভাঙার ভঙ্গি করে, তখন তার হাত ও বুকের ডোলে যে ভঙ্গিমা হয়, তার কাছে অ্যালজ্যাব্রা জ্যামিতি পদে পদে তুচ্ছ হয়ে থাকার সম্ভাবনা।

উনিশ দিনের দিন, নিরালা মেঘলা সন্ধেবেলায় মেয়েটি আমার হাতের উপর হাত রেখে আদুরে গলায় বলল, খালি পড়া আর পড়া। আজ পড়া না, আসুন আজ গল্প করি।

গলার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়, এসব মেয়ের প্রতি বাপ মা বেশি মনোযোগ দেয়নি। এসব মেয়েদের বেশ অল্প বয়সেই বাড়ির চাকরের সঙ্গে ভাব হয়। উষ্ণ হাতের পাঞ্জায় মেয়েটি আমার হাতে চাপ দিল। আমি কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। মনে মনে বললুম, আহা রে খুকি, আমি কি তোমার মনের ইচ্ছা জানি না। আমারও কি সাধ আহ্লাদ জাগে না? আমারও কি ইচ্ছে হয় না, জ্যামিতির বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোমার ঐ কচি ঠোঁট দুটি নিয়ে খেলা করি? কিন্তু কোথা থেকে তোমার বাড়ির লোকজন কেউ যদি এক ঝলক দেখে ফেলে তারপর মার খাব কি খাব না সেটা পরের কথা—কিন্তু চাকরিটি তো যাবে। মেয়ের বদলে অন্য মেয়ে পাওয়া যায়, এমনকি প্রেম গেলেও অন্য প্রেম আসে, কিন্তু চাকরি? ওরে সর্বনাশ। পঞ্চাশ টাকার চাকরিটা হারাবার রিস্ক নিয়ে তোমার সঙ্গে ছেলেখেলা করার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

আমি হাত সরিয়ে নিয়ে বললুম, না, লিলি, এখন মন দিয়ে পড়াশুনো করো, পরীক্ষা হয়ে যাবার পর অনেক গল্প করব। পরীক্ষার পরও আমাকে তোমাদের বাড়ি আসতে দেবে?

সাতাশ দিন কেটেছে আর তিনদিন, আর তিনদিন পরেই সেই সোনার দিন। এরা আবার এক তারিখেই দেয় তো। প্রথম টাকা পেয়েই ডজনখানেক বেলুন কিনব। তিনটে দেব পিসতুতো ভাইয়ের ছেলেকে, তিনটে ফাটিয়ে ফেলব নিজে, আর ছটা উড়িয়ে দেব আকাশে, এমনিই।

সাতাশ দিনের দিন, অঙ্ক কষাতে কষাতে প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে গেল। যখন বেরিয়ে এসেছি খুবই ক্লান্ত। নিজের ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়, আরেকটু হলেই অঙ্কে ফেল করতুম, এখন মেয়েটিকে শেখাবার জন্য বাড়িতে রোজ জ্যামিতির এক্সট্রা কষি। এখন অনেক বড়ো পরীক্ষা। সেদিন খুবই ক্লান্ত লাগছিল। অনাদিন নিউ আলিপুর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত হেঁটে এসে ট্রামে উঠি। আজ আর ভালো লাগল না, পকেটে একটা সিকি আছে বলে খানিকটা বিলাসিতার লোভে সেখান থেকেই বাসে চেপে বসলুম। আর তো মোটে তিনদিন।

জানলার ধারে বসার জায়গা পেয়ে আস্তে আস্তে মন ভালো হচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে কণ্ডাক্টর এল টিকিট চাইতে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে সিকিটা বার করে দিলাম।

—অচল, পাল্টে দিন।

অচল? অসম্ভব? মায়ের লক্ষ্মীর সিংহাসন থেকে গোপনে সরিয়ে এনেছি, সেই সিকি কখনো অচল হতে পারে? ঠাকুর দেবতাকে কেউ অচল পয়সা দেয় নাকি। আমি বললুম, মোটেই অচল নয়, ভালো করে দেখুন।

কণ্ডাক্টর বলল আপনিই দেখুন না। হাতে ঘষলুম, হাতে একেবারে রঙে রঙ হয়ে গেছে, পাল্টে দিন।

সিকিটা আমি হাতে নিয়ে দেখলুম। সত্যি, সেটায় কোনো পদার্থ নেই। ঠুকলে টক টক-এর বদলে ঢ্যাব ঢ্যাব শব্দ। আমি অসহায় ভাবে বললুম, আমার কাছে তো আর খুচরো নেই।

—নোট দিন ভাঙিয়ে দিচ্ছি। ক'টাকার নোট, পাঁচ টাকার?

আমি বললুম, না, একশো টাকার—

কণ্ডাকটার সমেত বাসের বহুলোক হেসে উঠল। আমি চটে উঠে বললাম, হাসির কি আছে এতে? দেখবেন? আমি পকেটে হাত দিলাম।

কণ্ডাক্টর বলল, না, না, দরকার নেই, ভয় পেয়ে যাব। জীবনে কখনো একশো টাকার নোট দেখিইনি, হঠাৎ কেন এখন দেখিয়ে চমকে দেবেন? আপনি বরং টিকিট না কেটে এমনিই যান।

—কেন, এমনি যাব কেন? বেঁধে দিন, আমি নেমে যাচ্ছি। মাঝপথে নেমে এসে বিশ্ব সংসারের ওপর অসম্ভব ক্রোধ হয়। হঠাৎ মনে হয়, ওষুধের কোম্পানির চাকরিটা যখন ছেড়েই এসেছি তখন আসবার আগে সত্যি সত্যি মালিকের দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে আসিনি কেন। একটা কিছু করা সত্যিই দরকার। যত রাজ্যের চোর জোচ্চোররাই নির্বিঘ্নে সুখে থাকবে এ দুনিয়ায়।

এতক্ষণ বকবক করে পড়িয়ে এসে ক্লান্ত, ক্ষিদে পেয়েছে, এখন এতটা পথ হেঁটে যাবার কথা ভাবতেই কি রকম যেন অভিমান বোধ হলো। পথের দিকে তাকিয়ে বললুম, আমাকে এত কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ কি? না, আমি হেঁটে যাব না। যে-কাজ আগে কখনো করিনি, ঠিক করলুম, সেইভাবেই ফিরতে হবে। অন্য বাসে উঠে আবার এই সিকি দেখাব। যদি না নেয় নেমে পড়ব, কিছুটা দূর তো যাওয়া যাবে। এইভাবে কয়েকটা বাস বদলাতে পারলেই হলো।

দোতলা বাস থামিয়ে উঠে পড়লাম। ওঠা নামাতে যাতে কিছুটা সময় যায় এই জন্য ভাবলুম দোতলায় যাব। খুব বেশি ভিড় ছিল না, কণ্ডাক্টর দু'জনেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসেই দেখলাম একটা মোটাসোটা মানি ব্যাগ। আমার পায়ের কাছে। নীচু হয়ে তুলে নিলাম। ব্যাগটা খোলামাত্র আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল। থরে থরে একশো টাকার নোট সাজানো। অন্তত বারো তেরোখানি নিশ্চিত, এ ছাড়া কিছু আজেবাজে পাঁচ-দশ টাকার খুচরো নোট, কয়েকখানা ছাপানো কার্ড। আমার বুকের ভিতরকার শব্দ বাইরের সব শব্দ ঢেকে দিল। আমার হাত কাঁপছে, চোখের চারপাশে জ্বালা করছে।

তবু আমি গলার শব্দ পরিষ্কার করে বললুম, মানি ব্যাগটা কার? এই মানি ব্যাগটা কার?

কয়েকজন যাত্রী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কেউ কোনো কথা বলল না। আমি হাত উঁচু করে বললাম, এটা কার? কেউ কোনো সাড়া দিল না। আমি তখন অনেকটা আপন মনেই বললাম, কেউ বোধহয় নামার সময় ফেলে গেছে। কণ্ডাক্টরকে জমা দিয়ে আসি।

তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে, যদি বাস থেকে নেমে পড়তে পারি, তাহলে এসব টাকাই আমার। ময়দানের পাশ দিয়ে চৌরঙ্গির ফাঁকা রাস্তায় বাস দুর্দান্ত স্পীডে যাচ্ছে, আমি এসে পা-দানিতে দাঁড়ালাম। আর কয়েক মুহূর্ত, বাস থেকে নেমে গেলেই আমি পথের জনতার সঙ্গে মিশে যাব। এত স্পীডে যাচ্ছে যে আমার পক্ষে লাফিয়ে নামা অসম্ভব। আমি অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। এক হাজার টাকা? অবিশ্বাস্য? ব্যাগটা আমার হাতের মুঠোয়। কি চমৎকার তার স্পর্শ। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, অসাবধান হলেই টাকা হারায়, যে লোকটার টাকা হারিয়েছে—অসাবধানতার জন্য তাকে তো ফল ভোগ করতে হবেই। আমার কি দোষ? আর সিগারেটের দোকানের সাতান্ন টাকা ধার কালই শোধ করে দেব, দিদিমার জন্যে একটা গরমের কাপড় কিনে নিতে হবে, বাবার ছবিটার কাঁচ ভেঙে পড়ে আছে কতদিন। এমনকি একথাও আমার এই মুহূর্তে মনে হলো, সব টাকাটা খরচ করব না, ব্যাগের মধ্যে লোকটার ঠিকানা তো আছেই, পরে কখনো ওকে টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

এ পাশে অন্ধকার ময়দান, পার্ক স্ট্রীটের আলো দেখে বাসটা থামবেই, আমি সমস্ত শরীর সজাগ করে রেখেছি একটু স্পীড কমলেই লাফিয়ে নেমে পড়ার জন্য। কিন্তু তার আগেই সিঁড়ি দিয়ে দুম-দুম করে নেমে আসতে আসতে একজন ভারী চেহারার অন্যপ্রদেশী বলল, মেরা পার্স কৌন লিয়া? মেরা পার্স?

একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। চোর পকেটমার ধরা পড়লে কী রকম মারধোর করা হয়, তা তো জানি। সর্বস্বান্তের মতন উদাসীনভাবে আমি ব্যাগটা বাড়িয়ে দিলাম কোনো কথা না বলে। লোকটা লোভীর মতন হাত থেকে সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। একতলা থেকে আর একটি লোকও এগিয়ে আসছিল, সে বলল, কি, চুরি করেছিলেন?

আমি প্রায় ফিসফিস করে উত্তর দিলাম, না, কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—কুড়িয়ে পেয়েছেন তো কারুকে জিজ্ঞেস করেননি কেন?

—জিজ্ঞেস করেছিলুম সত্যিই।

—চোপ। আমি নিজের চোখে দেখলুম, তুমি পালাবার জন্য হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুঁকে ছিলে। কী মশাই, আপনার পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছিল নাকি? পার্ক স্ট্রীটের সবুজ আলো পেয়ে বাসটা থেমেই ছুটেছে। অন্য প্রদেশী সেই লোকটি ব্যাগটা হাতে পেয়ে আর কোনো কথা বলেনি, আমার খুব কাছে নেমে এসে চোখে কি রকম একটা ভঙ্গি করে হঠাৎ ঝুপ করে সেই চলন্ত বাস থেকেই লাফিয়ে পড়ল। পড়ার ঝোঁকে মাটিতে উল্টে গেল, তারপর তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়েই হন্‌হন করে হাঁটতে লাগল।

কণ্ডাক্টরদের মধ্যে একজন বলল, কী, ব্যাগটা দিয়ে দিলেন। ওটা সত্যিই ওর কিনা জিজ্ঞেস করে দেখবেন তো। ভেতরে কি ছিল?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিছুই বলার নেই আমার। কণ্ডাক্টরটি আবার বলল, ঐ লোকটার ব্যাগ বলে তো মনে হয় না, এমনভাবে পালাল কেন? আর আগেই দিয়ে দিলেন। ভেতরটা খুলে কাগজপত্র কি আছে মিলিয়ে দেখবেন তো।

অপর লোকটি বলল, দেখবে কি করে, সে সাহস কি আছে? ও নিজেই তো একজন চোর।

আমি লোকটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। পাথরের মতন মুখ নাক চোখ সব যেন খোদাই করা। মুখের ছবিতে মমতা কিংবা নিষ্ঠুরতা—কোনো ভাবই নেই। গলার আওয়াজ গম্ভীর। লোকটি আমার কলার মুঠো করে চেপে ধরেছে।

আমি দীনের চেয়েও দীন গলায় বললুম, বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি, আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—তা হলে পালাবার চেষ্টা করছিলে কেন? লোকটার হাতে যখন তুমি ব্যাগটা তুলে দিলে তখন তোমার মুখ অবিকল চোরের মতন দেখাচ্ছিল, জান?

কণ্ডাক্টরটি বলল, মশাই, আপনার জন্যই তো ঐ পাঞ্জাবিটা ব্যাগটা নিয়ে পালাল। আপনি তো আমাদের কাছে দিলে পারতেন, আমরা মিলিয়ে দেখতাম, ও লোকটাই আসল মালিক কিনা—

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। ঐ ঘটনার পরের মাসেই দৈবাৎ অন্য একটি ওষুধের কোম্পানিতে আবার চাকরি পাওয়ায় আমার সব অসুখ সেরে যায়। তারপর আবার বিকেলের এলমেলো হাওয়ায় মন খারাপ হওয়ার জন্য আমি মনকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করি। বন্ধুদের সামনে উদারভাবে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বিলি করতে পারি। কাছাকাছি মেয়েদের দেখলেই উসখুস করে উঠি, আলাপ বা একা সিনেমায় নিয়ে যাবার জন্য ছল-ছুতো খুঁজতে থাকি। অর্থাৎ আবার আমি স্বাভাবিক হয়ে গেছি, যেহেতু চাকরি পেয়েছি। এমনকি মাঝে মাঝে ভিখারিকে

পয়সা দিতেও আমার আটকায় না। টিউশনি করা পরের মাস থেকেই ছেড়ে দিয়েছিলুম।

পিসতুতো বোনের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, পকেটের রুমালে সেন্ট মাখিয়ে। সমস্ত রকম আইন ভেঙে বিরাট নেমন্তন্ন, প্রচুর আলো ও হৈ-চৈ, কারণ পাত্রটি একটি রত্ন ও খুব শাসালো। বরের সঙ্গে বরযাত্রীরা দঙ্গলে মিলে ইয়ার্কি চালিয়েছে। তাদের মধ্যে আমি বাসের সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম যে আমার কলার চেপে ধরে আমাকে চোর বলেছিল। সেই রকম নিরেট পাথরের মতন মুখ। চার বছর বাদেও আমি লোকটিকে দেখা মাত্র চিনতে পারলুম। লোকটিও আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর দুজনেই মৃদু হাসির জন্য ঠোঁট ফাঁক করলুম।

লোকটির নাম গগন মৈত্র। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গেল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে আমরা গল্প করতে লাগলুম। কথায় কথায় আমি হাসতে হাসতে বলে ফেললুম, আপনি কিন্তু সেদিন বাসের মধ্যে চোর চোর বলে বড্ড অপমান করেছিলেন।

গগনবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, বাঃ, আপনি তো সত্যিই চুরি করেছিলেন।

আমি বললুম, মোটেই না। আপনি খালি ভুল করছেন। প্রথমত আমি ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, দ্বিতীয়ত, অন্য একজন লোক সেটা চাওয়া মাত্র তার হাতে দিয়ে দিয়েছি। একে চুরি বলে?

—আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় কথাটার মাঝখানের ব্যাপারটুকুই আসল। কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ঠিকই, ফিরিয়ে দিয়েছিলেনও ঠিক, কিন্তু মাঝখানের সময়টুকুতে আপনি ব্যাগটা নিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন। ঐটাই চুরি। আপনি সার্থক হতে পারেন নি বটে, কিন্তু চেষ্টা তো করেছিলেন চুরি করার।

—আমার তখন কি অবস্থা ছিল আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। চুরি কেন, খুন ডাকাতি করাও তখন আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু আপনি আমাকে মার খাওয়াবার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? টাকাগুলো তো আমি নিইনি, তবু বাসের সব লোককে দিয়ে আপনি আমাকে মার খাওয়াতে চাইছিলেন।

—চোরের মার খাওয়া দেখতে বড়ো ভালো লাগে। আপনার লাগে না? আপনি নিজে কখনো কোনো চোরকে মারেননি?

—হ্যাঁ, একবার মামাবাড়ির একটা চাকর ঘড়ি চুরি করেছিল, তাকে খুব মেরেছিলাম।

গগনবাবু হো-হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, তা হলে গোড়া থেকে ব্যাপারটা শুনুন। আজকের যে বর, সে হচ্ছে আমার মাসতুতো ভাই। ওদের

কিসের ব্যবসা জানেন? পেন পেন্সিলের ব্যবসা, আমি ওদের পার্টনার। কিন্তু ব্যবসার আসল অংশ হচ্ছে, একটা বিখ্যাত বিদেশী পেনের জাল করে দিশি পেন সেই নামে বিক্রি করা। আমি কমার্সের ছাত্র ছিলুম বলে খাতাপত্র হিসেব টিসেব আমিই রাখি, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কায়দা-কৌশল আমারই। সুতরাং আমি নিজেও একটা চোর ছাড়া কি? যে বাড়িতে ভাড়া থাকি, সে বাড়ির মালিকেরও বেবি ফুডের ব্ল্যাক মার্কেটিং ব্যবসা আছে, অর্থাৎ থাকি চোরের বাড়িতে। আমার ছোট ছেলে চাকরি করে যা মাইনে পায় তার দুগুণ উপরি। সুতরাং আমাদের পরিবারটিই চোরের পরিবার বলতে পারেন। আমার ছেলে লেখাপড়াতে ভালোই ছিল, হঠাৎ এ বছর ফেল করেছে। ইংরেজির মাস্টারমশাই বলে যে তাঁর কোচিং-এ ভর্তি না হলে, আমার ছেলের পাশ করার আশা নেই। অর্থাৎ মাস্টারটি চোর। আর চোরের কাছে যদি লেখাপড়া শেখে ছেলেটিও একটি চোর ছাড়া আর কি হবে? তা হলে ভেবে দেখুন, চার পাশে চোর একেবারে থিকথিক করছে কিনা। খবরের কাগজ খুলে দেখুন নামকরা চোরদের ছবি আর কথাবার্তা। কারুকে কিছু বলার উপায় নেই—সুতরাং হয়তো হাতের কাছে কোনো ছিঁচকে চোর ধরা পড়ল তাকে মারধোর করে নিজেকে সাধু সাজাবার ইচ্ছে হয় কিনা বলুন। চোরকে যখন মারা হয়, তখন এটা অন্তত প্রমাণ হয়, যারা মারছে, তাঁরা অন্তত চোর নয়। ঐটুকু সময় সাধু সাজার লোভ কে ছাড়তে চায়! এখন বলুন, আপনার চেনাশুনো জগতে এরকম চোর আছে কিনা।

আমি বললুম, অঢেল অঢেল! এখন যে ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করছি, তাদের এক ধরনের ওষুধে স্রেফ জল মেশানো বলে ধরা পড়েছিল। অন্য অনেকগুলিতেও ভেজাল আছে বলে আমরা জানি। এসব জেনেশুনেও চাকরি ছাড়তে পারি না কারণ চাকরি ছাড়লে সত্যি সত্যি নিজের হাতে চুরি করতে হবে, আর চাকরি রাখলে নিজের হাতে না করে, চুরির টাকাটাই মাইনে হিসেবে বখরা পাব। এর মধ্যে দ্বিতীয়টাই সুবিধে কারণ দ্বিতীয়টায় মার খেতে হয় না। তাছাড়া, এই রকম সিল্কের জামা গায় দিয়ে এমন সুন্দরভাবে থাকা যায় লোকে ঘুণাক্ষরেও চোর বলে সন্দেহ করতে পারবে না। কি বলেন!

গগনবাবু আর আমি দুজনেই হাসতে লাগলুম।

২

দুপুরের দিকে সদর দরজায় ঠুক-ঠুক আওয়াজ। ভেতর থেকে প্রশ্ন : কে? বাইরে

থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম উত্তর এল, মা-নি-অ-র্ডা-র।—একটু টেনে টেনে উচ্চারণ, কিন্তু এমন সুমিষ্ট স্বর আর হয় না। দরজায় কেউ কড়া নাড়ার পর, দরজা খুলে যাকে দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়া যায়, সে হলো এই ব্যক্তিটি। মানি অর্ডার পিওন। অবশ্য, এ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ আমার জীবনে খুবই কম ঘটে।

একটা জিনিস লক্ষ করেছি, একই পিওন মানি-অর্ডার এবং রেজেস্ট্রি চিঠি বা পার্শেল ইত্যাদি আনে। কিন্তু যেদিন মানি অর্ডার আনে—সেদিন তার গলার স্বরটা সত্যিই মিষ্টি হয়ে যায়, উচ্চারণ করে টেনে টেনে। আর অন্যদিন, খানিকটা কর্কশভাবে, দ্রুতভাবে বলে, রেজেস্ট্রি।—একই লোকের দু' কাজে দু' রকম গলা।

আর, যে টেলিগ্রাম আনে, তার ভঙ্গি অন্যরকম। সে ডাকে না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলে ক্রিং ক্রিং করে। লাল রঙের সাইকেলে, খাকি পোশাকের মানুষ, তার হাতের কাগজটায় কি রঙের খবর থাকে সে জানে। টেলিগ্রাম আসার কথা শুনলেই বুক দুরুদুরু, চোখের কাঁপন, কপালে ঘাম, হাতেব পাতা চুলকোন। এ ব্যাপারে আমিও খানিকটা পুরোনোপন্থী, টেলিগ্রামের কথা শুনলে ভয় হয়। কারণ, আমাদের দেশে শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ, ধন্যবাদ ইত্যাদি টেলিগ্রামে পাঠানোর এখনো তো রেওয়াজ হয়নি। হয় কোনো দুর্ঘটনা, অথবা এমন কোনো আকস্মিক সুখবর —যার ধাক্কা সামলানোও কম কথা নয়। বলা বাহুল্য, আমি টেলিগ্রামে এ পর্যন্ত কোনো সুখবর পাইনি। বরং একবার একটা টেলিগ্রামে দু'-দুটো দুসংবাদ পেয়েছিলাম। সেটা বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। তখন পর্যন্ত আমি এমন বোকা ছিলুম যে, লটারির টিকিট কিনতুম। অবশ্য, পাঁচ বছর আগে সেই শেষবার।

যাই হোক, লটারির টিকিট কিনে কেই-বা তেমন মাথা ঘামায়। অনেক সময়ই কিনতে হয় উপরোধে, অফিসের বেয়াবাবা গছায়, অথবা পাড়ার মুদি অথবা কোনো বেকার প্রৌঢ়। টিকিটটা কিনে সকলেই বাড়িতে ফেলে রাখে—বিশেষ মাথা ঘামায় না কেউ—লটারি কোম্পানিগুলির প্রতি সবারই অগাধ বিশ্বাস, যে, নাম উঠলে টাকা ঠিক বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এ ছাড়াও, এ বিষয়ে কুসংস্কার এই যে, লটারির টাকা নিয়ে একদম ভাবা উচিত নয়, ও কথা ভুলে যেতে হয়, চেষ্টা করেও ভুলে যেতে হয়—তা হলেই টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকে। ও টাকা সকলেই হঠাৎ পায়, যারা পেয়েছে—তারা সকলেই নাকি টিকিট কেনার কথা ভুলে গিয়েছিল। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম, চেষ্টা না করেও। তারপর, শীতেব শেষে যখন গরম জামাকাপড় কাচতে দিতে হবে, প্যান্ট-কোটের পকেট পরিষ্কার করছি, কোটের বুক পকেট থেকে লটারির টিকিটটা বেরুল। কাগজটা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগে, অলস নয়নে সেটার দিকে একবাব চোখ বুলিয়ে দেখি, গতকালই ছিল সেটার ড্রয়িং-এর তারিখ। আমি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আয়নার

দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বললাম, কাল যদি আমার নাম উঠে থাকে, তাহলে, আজই টেলিগ্রাম এসে যাবে। মন্দ হয় না টাকাটা পেলে—এত ধার হয়ে গেছে বাজারে।

ঠিক সেই সময় সদর দরজার কাছে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং এবং সরু গলায়, টেলিগ্রাম। এরকম আশ্চর্য যোগাযোগেও বুক ধক্ করে উঠবে না, এমন কঠিন মানুষ আমি নই। কাল লটারির ড্রয়িং ডেট ছিল, আজই টেলিগ্রাম আসার কথা, আজই এই সময় হঠাৎ আমার হাতে লটারির টিকিট এবং বাইরে টেলিগ্রাম পিওন। আমি বললুম, মন শান্ত হও। শুনেছি, এই রকম অবস্থায় অনেকের হার্টফেল করে। অনেকে এমন লাফ দেয় যে, ছাদকাঠে মাথা ঠুকে যায়। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে টেলিগ্রাম পিওনকে বললুম, দাঁড়ান, যাচ্ছি। তারপর, আস্তে-সুস্থে জামা গায়ে দিয়ে, কলম খুঁজে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম। সিঁড়ির প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছি, আর আমি মনে মনে হিসেব করছি—এক লক্ষ টাকা দিয়ে কি করব। প্রত্যেক সিঁড়িতে আমার প্ল্যান বদলে যাচ্ছে। শেষ সিঁড়িতে হঠাৎ আমার পা মচকে গেল।

পাঠকদের আমি আর উৎকণ্ঠায় রাখতে চাই না। আমার এ লেখার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমি লটারির এক লক্ষ টাকা পাইনি। এক লক্ষ টাকা যারা পায়—তাদের লেখা কত সুন্দর হয়—ঘন নিটোল লেখা যা শুধু লেখা হয় চেকবইতে। আমি অনেক পত্র-পত্রিকায় বা বইতে লেখার সুযোগ পেয়েছি, চেকবইতে আজ পর্যন্ত পেলাম না। সে যাই হোক, সে টেলিগ্রাম ছিল আমার বড়দির স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ। বড়দির স্বামীর, অর্থাৎ আমার বড়ো জামাইবাবুর যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, অনেকদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন, তাঁর মৃত্যু খুব আকস্মিক নয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু-সংবাদে আমি শোকে এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে, চার পাঁচ দিন পর্যন্ত মুহ্যমান, বাড়ির সকলে নিজেদের শোক ভুলে আমাকে সান্ত্বনা দিতেই ব্যস্ত।

টেলিগ্রামের প্রসঙ্গে আরেকটি লোকের কথা মনে পড়ে। কুনওয়ার সিং। একবার একটা চাকরির ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম। বেহালার দিকে সেই কোম্পানির ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সেইখানে ট্রেনিং—খুব সাহেবী কায়দায়, সব সময় সুট-টাই পরে থাকতে হয়, ইংরেজি ছাড়া বাক্য নেই—দু' সপ্তাহের বেশি আমি সেখানে টিঁকতে পারিনি অবশ্য। সেই হোস্টেলে আমার রুমমেট ছিল কুনওয়ার সিং। জাতে সে রাজপুত, দু-তিন পুরুষ ধরে বাংলাদেশে আছে এবং তার মুখের বাংলা বাগবাজারের মতো দন্তের-স বহুল। বিয়েও করেছে বাঙালি মেয়েকে। একদিনেই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল, ভারী ভালো লেগেছিল ছেলেটিকে—সবল, বিশাল চেহারা, অথচ লাজুক মৃদু স্বভাব। একদিন এক সঙ্গে বসে আছি, ওর নামে একটা টেলিগ্রাম

এল। কুনওয়ার সিং সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা আর না নিভিয়ে, সেই শিখার ওপরে ধরল টেলিগ্রামটা। তখনো খাম খোলেওনি। আস্তে আস্তে সেটাকে পুড়িয়ে ফেলল। আমি স্তম্ভিত। কোনো কথা জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, দয়া করে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

তারপর একদিন অন্তর একদিন, কুনওয়ারের কাছে টেলিগ্রাম আসতে লাগল। প্রত্যেকবারেই না-পড়ে সেটা পুড়িয়ে বা ছিঁড়ে ফেলত। আমি আজ পর্যন্ত কুনওয়ারের টেলিগ্রামের রহস্য জানতে পারিনি। অন্য সব বিষয়ে সে বহু কথা বলত, টেলিগ্রাম বিষয়ে কিছু বলত না। টেলিগ্রাম পাবার পর খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থাকত। টেলিগ্রাম পিওনও বোধহয় তার সারা জীবনে, একই লোককে দশ দিনে পাঁচ বার টেলিগ্রাম দেয়নি। একদিন সে হঠাৎ কুনওয়ারের কাছে বখশিস্ চেয়ে বসল। কুনওয়ার মৃদু হেসে ওকে একটা টাকা দিয়ে, সেদিন ওর সামনেই টেলিগ্রামটা ছিঁড়ে ফেলেছিল অন্যবারের মতো না পড়েই।

পিওনের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে রহস্য যারা চিঠি বিলিয়ে যায়, তারা আসে এবং যায় নিঃশব্দে। দরজার ফাঁক দিয়ে কিংবা লেটার বক্সে কোন এক সময় ওই সব আঠা-মোড়া রহস্য ফেলে রেখে যায়। চিঠির বাক্সে কোনো খাম দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে আমার। মনে হয়, একদিন এমন একটা চিঠি আসবে, যাতে আমার জীবনটা বদলে যাবে। কী সেই চিঠি, আমি নিজেও জানি না। তবু প্রতীক্ষা করি। খামের ওপর ঠিকানার হাতের লেখা বেশি হলে ভালো লাগে না। নীল খাম দেখলেই মনে হয় সম্পূর্ণ অজানা কোনো তরুণীর কাছ থেকে এসেছে হয়তো।

এরকম ক্বচিৎ দু-একটা আসেও কিন্তু তারা আর কেউ দ্বিতীয়বার লেখে না।

৩

সারা মেদিনীপুর জেলাটার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হাট বসে বীনপুরে, সোমবার। মঙ্গলবার আবার বিজয়া দশমীর দিন, শিলদায় মেলা। সেও খুব ভারী মেলা, দূর-দূরান্তের লোক আসে। সুতরাং এই একটা দিন এ অঞ্চলে বহুলোকের আনাগোনা।

বীনপুরের থানার পাশেই দুর্গাপুজো হচ্ছে, সুন্দর মণ্ডপে পুরোহিত তখনো মন্ত্র পড়ছেন। মণ্ডপের কাছেই চেয়ার টেবিল পেতে থানার বড়োবাবু সেদিনের কাজ করছেন—এমন সময় চারজন যুবককে নিয়ে আসা হলো—এরা 'ছত্রীবাহিনী' বলে ধরা পড়েছে।

দারোগা সাহেব এবং আশেপাশে আর যাঁরা বসেছিলেন—সকলেই প্রথমটা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন—জমাদারের মুখে ছত্রীবাহিনীর খবর শুনে। বিজয়া দশমীর দিন সকালবেলা—কি সর্বনাশের কথা।

একে একে চারজন ছত্রী ঢুকল—মাইল দশেক দূরে, বেলপাহাড়ীতে এরা ধরা পড়েছে, সেখানকার তৎপর হোমগার্ডের সর্দার বিরাট চিঠি লিখে একটিমাত্র চৌকিদার সঙ্গে দিয়ে বাসে করে এদের পাঠিয়েছে থানায়। ওরা বেশ শান্তভাবেই সুড়সুড় করে থানায় ঢুকল।

সার্ট-প্যান্ট পরা চারজন যুবক, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি—মুখেচোখে কোনো বিশেষত্ব নেই—আরো হাজার হাজার যুবকদেরই মতো দেখতে। তবু, ওদের পোশাক বা মুখের রেখায়—এমন একটা কিছু আছে যা দেখলেই বোঝা যায়—ওরা কলকাতার লোক। কলকাতার ছেলেদের একটা দাগ থাকে তাদের মুখে—যেটা কলকাতার বাইরে গেলে বুঝতে পারা যায়। দারোগা সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীরা 'ছত্রী'দের দেখে মৃদু হাস্য করলেন, ছত্রীদের মুখে হাসি।

দারোগা সাহেব বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো।

ছত্রীদের একজন বললেন, আমরা ছত্রী হই, সেও ভালো, কিন্তু আমরা মুরগি চোর নই।

—সেকি ব্যাপার। বসুন, বসুন। এই চেয়ার দাও এঁদের চারজনকে।

ছত্রী চারজন বসল। কলকাতার নানা অফিসে মোটামুটি সম্মানজনক কাজ করে ওরা। দারোগা সাহেব প্রথমে জিজ্ঞেসবাদ করে ওদের সম্পূর্ণ পরিচয় নিলেন। সকল সন্দেহের উর্ধ্বে ওদের পরিচয়—দু-একজনের কাছে অফিসের কার্ডও ছিল। এ ছাড়া মেদিনীপুরে চেনাশুনো জন দশেক উল্লেখযোগ্য লোকের নাম করল। তাছাড়া মুখের চেহারা ও কথাবার্তাই ওদের পরিচয়।

নিঃশ্বাস ফেলে দারোগা সাহেব বললেন, শেষকালে বেলপাহাড়ীতে আপনাদের ছত্রী বলে ধরল? এত জায়গা থাকতে বেলপাহাড়ীতেই বা আপনারা গেলেন কেন?

চারজনের একজন উত্তর দিল, দেখুন, বেলপাহাড়ীতেও এ কথা আমাদের বার বার জিজ্ঞেস করেছে। আমরা অবাক হয়ে গেছি। বেলপাহাড়ীতে যাব না কেন। যেখানেই যাই—অন্য জায়গা ছেড়ে সেখানে গেলাম কেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে, ছোট্ট জায়গা বেলপাহাড়ীতে যাবার ইচ্ছে আমাদের কেন হয়েছিল—তা বলতে পারি। বছর খানেক আগে আমাদের এক বন্ধু ঝাড়গ্রাম থেকে গিধ্‌নি যাচ্ছিল বাসে চেপে। মাঝ পথে ছোট্ট জায়গায় বাস থামে সন্ধেবেলা—শালের জঙ্গল পেরিয়ে এসে ছোট একটা ছবির মতো ঝকঝকে সুন্দর গ্রাম, ছবির মতই

নির্জন—সে হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়ে দু'দিন থেকে যায়। পরে, সে আমাদের ঐ গল্প বলে—ঐ জায়গাটাকে নাকি তার পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন জায়গা বলে মনে হয়েছিল—যেখানে একটাও কলকারখানা নেই, কোনো দেখার জিনিস নেই—পিচের রাস্তা দিয়ে দিনে মাত্র কয়েকখানা বাস আর ট্রাক যায়—সভ্য সমাজের সঙ্গে এইটুকুই মাত্র যোগাযোগ। অথচ টাটকা তরকারি পাওয়া যায়, মুরগির মাংস সুলভ, ভাত খাবার সময় একটাও কাঁকর দাঁতে লাগে না। বাংলা দেশেই এ রকম জায়গা আছে—এই নির্জনতার সুখ পাবার জন্য পাহাড়ে যেতে হয় না, এইসব বলেছিল।

বেলপাহাড়ের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। এবারে চার বন্ধু পুজোর চারটি দিনের জন্য এসেছিলাম ঝাড়গ্রামে। ছুটি কাটাতে বাংলা দেশের বাইরে যাওয়া আমাদের পছন্দ নয়—তা ছাড়া ট্রেনের ভাড়াও কম। কলকাতার মাইকের চিৎকার থেকে শুধু সরে আসা। ঝাড়গ্রামেও কিন্তু দেখলুম সেই মাইকের উৎপাত আর কলকাতার ভিড়—ভালো লাগছিল না, হঠাৎ একদিন সকালে দেখলুম একটা বাসের গায়ে লেখা আছে 'বেলপাহাড়ী'। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, হোটেল থেকে জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে সেই দুপুরেই বেলপাহাড়ীর বাসে চেপে বসলুম!

দারোগা সাহেব নম্র স্বরে বললেন, ঐ যে মুরগি চুরির কথা বললেন, সেই ব্যাপারটা কি?

যুবক চারজন এবার হাসল সশব্দে। একজন বলল, সেইটাই মজার। সেইজন্যই অনেকটা আমরা নিজে থেকে থানায় এলাম। বেলপাহাড়ীর কিছু লোক যখন আমাদের ছত্রী হিসেবে আজ সকালে গ্রেপ্তার করে—আমরা একটুও বিচলিত হইনি—ভেবেছিলুম, ওদের অগ্রাহ্য করেই আমরা বাসে চেপে চলে আসব। এসব বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করলে, আমরা দুপুরের ট্রেন ফেল করব—কালকের আগে কলকাতায় ফিরতে পারব না। বুঝতেই পারছেন, ঐ একটা রোগা-পটকা চৌকিদার আমাদের মতো চারটে যুবককে আগলে থানায় নিয়ে আসতে পারে—এটা হাস্যকর। কিন্তু ভেবেচিন্তে আমরা নিজেরাই এলাম। একটা মজার ব্যাপার বলার আছে। তাছাড়া, গুজবের তো শেষ নেই। যদি আমরা সোজা চলে যেতাম—তা হলে নিশ্চয়ই এ গুজব ছড়িয়ে পড়ত আগুনের মতো যে, চারজন সত্যিকারের ছত্রী সৈন্য ধরা পড়েও পালিয়ে গেছে। আমাদের চেহারার বর্ণনাও তখন বীভৎস বিকট হয়ে উঠত। আপনারাও নিশ্চয়ই তখন ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করতেন। আচ্ছা, ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলি।

দুপুরের দিকে বেলপাহাড়ী পৌঁছে দেখলুম, গ্রামটা সত্যিই সুন্দর—আমাদের বন্ধু যেমন বলেছিল। একদিকে কিছু সাঁওতালদের বাড়ি, রাস্তার একপাশে একটা

বিরাট মাঠ, অন্য পাশে ছোট ছোট শালের জঙ্গল। আমরা ঠিক করলুম, রাত্তিরটা এখানেই কাটাব। আমাদের সেই বন্ধু একজন সাঁওতাল ছেলের নাম বলেছিল —সেই ছেলেটিকে খুঁজে বার করলুম—সেই আমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দিল। প্রথমে ভেবেছিলুম রাত্তিরটা মাঠেই শুয়ে কাটিয়ে দেব। গরমের রাত— তারপর, রাস্তার পাশেই ঐ সাঁওতাল ছেলেটির একটি দোকান ঘরের বারান্দায় চৌকি পেতে থাকব ঠিক করলুম। আমাদের জিনিসপত্র ওখানে রাখা হলো। চমৎকার ঠাণ্ডা ভাবে সন্ধেটা নামল, কোথাও কোনো শব্দ নেই—মাঠ ভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় মাঠে গিয়ে বসেছি। একজন গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে—এইসব সময় বেসুরো গানও ভালো লাগে। মাঝে মাঝে সাইকেলে করে কিছু লোক—আমাদের চক্কর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় দেখি—জনা দশেক লোক দূর থেকে ভয়ার্ত স্বরে আমাদের জিজ্ঞেস করছে, আপনারা কে ওখানে? কে? শিগগিরই বলুন।

লোকগুলো এমন ভয় পেয়েছে যে আমাদের কাছে আসছে না। দূর থেকেই জিজ্ঞেস করছে। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে ডাকলুম। তখনো আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। লোকগুলি গুটিগুটি ভয়ে ভয়ে কাছে এল। এসেই কর্কশ ভাবে বলল, আপনারা সন্দেহজনক ভাবে এখানে বসেছেন কেন? দুপুর থেকে আপনাদের লক্ষ্য করছি। খুব সাবধান! আমাদের কাছে চালাকি চলবে না! আপনাদের পরিচয় বলুন। কোথা থেকে আসছেন?

প্রথমে ইচ্ছে হয়েছিল, দু' একটা রসিকতা করি। কিন্তু গ্রামের লোকেরা একটু সীরিয়াস ধরনের হয়, খুব একটা রসিকতা বোঝে—এ ধারণা আমাদের নেই। তা ছাড়া, লোকগুলির কর্কশ গলা শুনেই বুঝেছিলাম—ওরা আসলে ভয় পেয়েছে খুব। ভীতু লোকেরা কখনো স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারে না। তাছাড়া ইদানিং মানুষের মধ্যে গোয়েন্দাগিরির প্রবণতা এমন বেড়ে গেছে যে, স্বাভাবিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রায়। যে-কোনো কথার উত্তরেই এমন একটা হুঁ আওয়াজ করে —যার মানে, হুঁ-হুঁ বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! যেমন আমার নাম বললে এমন একটা হুঁ শোনা যায়—যার মানে কেন আমার বাবা-মা ঐ নামটা রাখতে গেলেন! অথবা, এই বললুম আমরা কলকাতার লোক—ঝাড়গ্রাম থেকে আসছি আজ— এ কথার মানে কি!

যাই হোক, আমাদের কথাবার্তায় সেই মুহূর্তে চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাদের ছত্রী বলে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলো না। কিন্তু, আমরা যেন মাঠ ছেড়ে সেই মুহূর্তে উঠে যাই। মাঠে বসা চলবে না! ওসব জ্যোৎস্না-ফোৎস্না বাজে কথা। কোনোরকম চালাকি করতে গেলেই আমাদের বিপদ—কারণ, আমাদের ওপর সব সময় নজর রাখা হবে।

আস্তানায় ফিরে এলাম। সন্ধেবেলাটা হঠাৎ বিস্বাদ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম —গ্রামের ঐ ছেলেদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করব—হলো না—বারান্দায় এসে শুয়ে রইলাম। মাঝে মাঝেই বুঝতে পারছি—সাইকেলে করে লোকেরা আমাদের লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কেউ সব সময় আমাদের লক্ষ্য করছে—এটা ভাবলে একদম ভালো লাগে না—নিজেদের মধ্যে গল্প করতেও ইচ্ছে হয় না। অবশ্য একটা কথা ভেবে ভালো লাগল—বেলপাহাড়ীর মতো এমন নগণ্য জায়গা—সেখানেও যুবকেরা দেশরক্ষার দায়িত্ব বুঝেছে। সবসময় সজাগ—এটা অন্তত ভালো চিহ্ন। রাত্রে ভালো খাবার পাওয়া গেল না, রুটি আর বেগুনের ঘ্যাঁট।

সকালেই আসল মজা। সকালবেলা বাসের জন্য বসে আছি। কিছু কিছু গ্রামের লোক আমাদের সঙ্গে দু' একটা কথা বলে যাচ্ছে। হঠাৎ আগের রাত্তিরের দুটি ছোকরা এসে বলল, আপনারা চকে চলুন। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেতে হবে আপনাদের।

হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। কোনো পঞ্চায়েত নয়—একটা চায়ের দোকানে কয়েকটি ছোকরা। তার মধ্যে সেই দুজন বিশেষ উৎসাহী—রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল, সত্যি করে বলুন, আপনারা কে? কাল যা বলেছেন সব মিথ্যে। মাঠে কেন বসেছিলেন—চাঁদের আলোয় বসে বসে গান করা—চালাকি পেয়েছেন। বেলপাহাড়ীতে কেন এসেছেন?

সকালবেলাতে এসব কথাবার্তা শুনতে মোটেই ভালো লাগে না। তবু যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিলুম। নিজেদের পরিচয় দিলুম। প্রমাণ দেখালুম। কিন্তু ছোঁড়া দুটি ক্ষেপে উঠেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল—সব মিথ্যা কথা। ছত্রী সৈন্য। ঠিক ধরেছি। শুধু শুধু বেলপাহাড়ীতে আসা! কেউ আসে! পুলিশে ধরাব।

ছত্রী সৈন্যর নাম শুনে গ্রামের বহু লোক ভিড় করেছে। দূর-দূরান্তে খবর চলে গেল। কিন্তু অনেকেই নিরাশ হলো। এ কি রকম ছত্রী সৈন্যের চেহারা।—একি কথাবার্তা। যাঃ। শুনেছি—ছত্রী সৈন্য নাম শুনেই অনেক জায়গায় মার লাগাতে শুরু করে—কিন্তু আমাদের গায়ে একটা লোকও হাত তুলল না কেন কে জানে। চাঁদের আলোয় এরা গান গেয়েছে, ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও একটা বাড়ির বারান্দায় শুয়েছে এগুলো কেমন কেমন ঠিকই, কিন্তু ছত্রী সৈন্য না রে। যান বাবুরা বাসে উঠুন।

সেই ছেলে দুটি তখন ক্ষেপে গেছে। যে-কোনো উপায়ে আমাদের গ্রেপ্তার করা চাই-ই! অথচ জনতার সমর্থন পাচ্ছে না। তখন ওরা দু'জন কোথা থেকে একটা মুরগির পা আর কিছু পালক এনে বলল, আমরা কাল রাত্রে মুরগি চুরি করে খেয়েছি। যে ছোকরাটি ক্যাপ্টেন, সে বিকট গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগল

—ছত্রী সৈন্য না হলে কেউ মুরগি চুরি করে খায়। দু'-দুটো মুরগি যার দাম তিরিশ টাকা।

জনতা এবার হাসাহাসি শুরু করেছে। আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ছোকরা দুটির বদমাইসি। এ পর্যন্ত ভাবছিলুম, ওরা অত্যধিক তৎপর, আমাদের ভোগাচ্ছে। যদিও কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য খারাপ না, উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি অচেনা লোককে ভালো করে যাচাই করে দেখা। কিন্তু এখন দেখছি বদমাইসি। ক্যাপ্টেন জনতাকে বলল আমার যে-কোনো লোককে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা আছে! আপনারা যদি আমার কাজে বাধা দেন তবে সে দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের! সঙ্গে সঙ্গে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে বলল, কি জানি বাবা! আমাদের কি দরকার। আমরা শুধু দেখতে এসেছি। তুমি ওদের গ্রেপ্তার করবে কি ছেড়ে দেবে—তার আমরা কি জানি!

ক্যাপ্টেন তখন আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে চোখ মটকে বলল, এবার কি করবেন? হয় আমাদের তিরিশ টাকা দিন নয় আপনাদের ছত্রী সৈন্য বলে থানায় পাঠাব। সেখানে আমার চিঠি পেলে, অন্তত তিনদিন তো হাজতে থাকবেনই!

আমরা বললুম, যে-মুরগি আমরা খাইনি, তার জন্য তিরিশ টাকা তো দূরের কথা এক পয়সাও দেব না। তার বদলে আমরা ছত্রী সৈন্য হিসেবে ধরাই পড়তে চাই!

কিছুটা লজ্জিত মুখে দারোগা সাহেব বললেন, চলুন পুজো শেষ হয়ে এসেছে। শান্তিজল নেবেন। আর একটু প্রসাদ খাবেন। পরের বাস তো দুপুরের আগে আর নেই। এখানেই দুপুরে চারটি ডাল-ভাত খাবেন। মায়ের প্রসাদ আপনাদের এখানে পাওনা ছিল—তাই এখানে আসতে হলো!

পরে তিনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, দুর্ভোগ হলো, বেড়াতে এসে এই হয়রানি—সেজন্য সত্যি আমরা লজ্জিত। তবে কি ভেবে হাসি পাচ্ছে জানেন? আগে পাগল বা ভিখিরিকে ছত্রী বলে ধরে আনত। তখন আমরা বলে দিলাম —ছত্রী সেনা ওরকম নয়—ছত্রীদের ভদ্রলোকদের মতো দেখতে হবে। তাই এবার ভদ্রলোক ধরে পাঠিয়েছে।

ওরা চারজনও হাসল। অন্যান্য বহু কথাবার্তা। একজন বললেন, বুঝলেন, গ্রামের ছেলেরা যে এরকমভাবে উৎসাহী হয়ে নিজের গ্রাম পাহারা দিচ্ছে, কলকাতায় বসে আমরা তা জানতুম না। দেখে প্রথমে বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু কিছু কিছু আবার এর সুযোগও নিচ্ছে। আমাদের কাছে যে তিরিশ টাকা দাবি করল শেষে, নইলে ছত্রী বলে ধরিয়ে দেবে—এসব বন্ধ হওয়া দরকার। আপনি এইটা শুধু দেখবেন।

দারোগা সাহেব অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির। আর চারজন ভদ্রসন্তানকে তাঁর এলাকাতেই এরকমভাবে বিব্রত ও অপদস্থ করায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করছিলেন। বললেন, ছি, ছি, লোকেরা নিজের দেশের মধ্যে বেড়াতেও পারবে না! আপনাদের পুজোর ছুটি কাটাবার আনন্দটাই মাটি করে দিল। থানা ও পুজামণ্ডপসুদ্দু সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ওদের খাইয়ে দাইয়ে, বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে বিকেলের দিকে বাসে তুলে দিলেন। সেই চারজনের মনে তখন আর কোনো গ্লানি নেই।

আমি এ গল্প শুনলাম ওই 'ছত্রী বাহিনী'র মুখ থেকেই সদ্য। গল্পটা এমন কিছু নয়। দেশের যুবসমাজ সজাগ হয়েছে, তৎপর হয়েছে এই কথায় বোঝা যায়! এর মধ্যে দু'একজন বাড়াবাড়ি করবেই—দু'একজন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবে এই ফাঁকে। এত বড়ো দেশের তুলনায় এরকম ঘটনা নগণ্য। নেহাৎ আমার চেনা লোকদেরই এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে—তাই শুনে বিশ্বাস করলুম, অন্য লোকের হলে পুরোটা বিশ্বাস করতুম না হয়ত, কিন্তু আর একটা জিনিস আমার আশ্চর্য লাগল। একটা না, দুটো। আশ্চর্যের এবং দুঃখের। এক, বেলপাহাড়ী যে সুন্দর এ কথা বেলপাহাড়ীর একজন লোকও জানে না। বদ মতলব ছাড়া শুধু বেড়াবার জন্যই যে কেউ ওখানে যেতে পারে তা কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি। অথচ জায়গাটা যে সুন্দর—বন্ধুদের মুখে শুনে বুঝতে পারলুম। ঐ চারজনের মধ্যে তিনজন পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে এসেছে, তাদেরও ভালো লাগল জায়গাটা, আর বেলপাহাড়ীর একটা লোকও নিজেদের জায়গার সৌন্দর্য চেনে না! দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, চাঁদের আলোয় মাঠে বসে গান গাওয়া কেন সকলের কাছেই অস্বাভাবিক মনে হল? গ্রামে কি একটা মানুষও থাকে না আজকাল—যার মনে হতে পারে, জ্যোৎস্নার রাত্তিরে মাঠে বসে গান করাই সবচেয়ে স্বাভাবিক? রোমাণ্টিসিজমও কি তা হলে বই পড়ে শিখতে হয়? আমার ধারণা ছিল, গ্রামের লোকেরা জন্ম-রোমাণ্টিক, অন্তত প্রত্যেক গ্রামেরই দু'চারজন।

৪

ছেলেবেলায় খুব ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটাকেই মনে হতো বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। তার এক মাস আগে থেকে হামানদিস্তেয় কাঁচ গুঁড়ানো, বাজারের পয়সা চুরি করে হাজার গজ কাঠিম কেনার উদ্যোগ এবং রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ লাল। দিগন্ত থেকে একটা কাটা ঘুড়ি উড়তে উড়তে

এসে যদি আমারই ছাদে পড়ত—তবে তার চেয়ে বড়ো উল্লাস আর কিছুতে বোধ করিনি। আকাশের একটা বদ অভ্যেস আছে, ঠিক বিশ্বকর্মা পূজোর দিনেই একবার অন্তত বৃষ্টি ঝরানো, এ জন্য আকাশের দেবতাকে কত অভিশাপ দিয়েছি।

একবার শীতকালে কাশীতে বেড়াতে গিয়ে দেখলুম, সেখানে শীতকালেও ঘুড়ি ওড়ে। তখন আমি ভেবেছিলুম, সব মানুষেরই উচিত—প্রতি বছর গ্রীষ্মকালটা কলকাতায় কাটিয়ে শীতকালে কাশীতে এসে থাকা।

খুবই নীচের ক্লাসে তখন পড়ি, একটা রচনা এসেছিল, 'তোমাকে যদি এক হাজার টাকা দেওয়া হয়, তুমি কি করবে? অন্য ছেলেরা খুব বুদ্ধিমান, তারা কেউ লিখল ভিখারিদের খাওয়াবে, কেউ লিখল নাইট ইস্কুল স্থাপন করবে, এমন কি একজন লিখেছিল যে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে আসবে। আমি লিখেছিলুম, 'আমি ঘুড়ির দোকান করিব এবং কম দামে ঘুড়ি বিক্রয় করিব।' পরোপকার এর চেয়ে বড়ো উপায় আমার জানা ছিল না। নাজির হোসেনের ঘুড়ির দোকানের সামনে কতদিন আমি করুণ চোখে তাকিয়ে থেকেছি, কালো রঙা কড়ি টানা চাঁদিয়ালের জন্য কি অসম্ভব লোভ ছিল, কিন্তু সেটার দাম দু'আনা, আমার দু' পয়সার বেশি নেই! মাস্টারমশাই আমার রচনা পড়ে কান মুলে দিয়ে বলেছিলেন, হুঁ! ঘুড়ির দোকান! তোর দ্বারা ওর চেয়ে বেশি কিছু আর হবেও না জীবনে!

কানমলা খাবার জন্যই নয় শুধু, ঘুড়ি ওড়াবার নেশা আস্তে আস্তে এমনিতেই কমে যায়। তখন বিষম ডিটেকটিভ বই পড়ার নেশা। রোমাঞ্চ সিরিজ পড়তে পড়তে মনে হতো, বড়ো হয়ে আমিও প্রতুল লাহিড়ীর মতন ডিটেকটিভ হবো। কাগজ পাকিয়ে পাইপের মতন তৈরি করে মুখে দিয়ে শার্লক হোমসের কায়দায় প্রায়ই গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়তুম। বাড়িতে কোনো অপরিচিত লোক এলে কুটিল চোখে তার জুতোর ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেখে নিয়ে মনে মনে গূঢ়ভাবে হেসে বলতুম হুঁ হুঁ! জানি, জানি!—তখনো আমার মুখমণ্ডল নতুন বেলুনের মতন নির্লোম ও মসৃণ, কিন্তু বড়ো হয়ে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ হবার পর আমার কি রকম গোঁফ থাকবে—তাও ঠিক করা হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের লালকেল্লায় বিচার হবার সময় সুভাষ বোসের কীর্তিকাহিনী সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, কি অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করেছিলুম তখন। নেতাজীর নাম শুনলেই শরীর কাঁপে। ডিটেকটিভ বই ছেড়ে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পড়তে শুরু করে দিয়েছি তখন। পড়ার টেবিলের সামনে মিলিটারি পোশাকে নেতাজীর ছবি, সেই দিকে তাকিয়ে গভীর নিশ্বাস পড়ে আমার। আর কি—ঠিকই করে ফেলা হয়ে গেছে। বড়ো হয়ে দেশের জন্যই আমি জীবন উৎসর্গ করব। বাবা মায়ের শাসন একটু শিথিল হলেই আমিও বন্দুক পিস্তল ছোঁড়া শিখব

গোপনে, পুলিশের তাড়া খেয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাব। (ছেলেবেলায় নেতারা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকে শুনে আমি ভাবতুম, সত্যিই বুঝি কলকাতায় নানা জায়গায় মাটির তলায় গোপন সুড়ঙ্গ আছে লুকোবার।) 'ভুলি নাই', বইখানা কতবার যে পড়েছিলাম তার আর ঠিক নেই, সাহেব দেখলেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতুম, আর একটু বড়ো হয়ে উঠি তারপর দেখাচ্ছি মজা! যে-সব সহপাঠীরা তখনো ঘুড়ি ওড়ায় কিংবা ক্যারাম খেলে সময় কাটায়—তাদের জন্য করুণা হতো। কথা নেই বার্তা নেই একদিন একটা গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, কি, ন্যাড়া হয়েছিস নাকি? তারপর টুপি খুলে ধরে টেনে, মাথায় চাঁটি মেরে একাক্কার কাণ্ড বাঁধাল।

কলেজে ঢুকেই হঠাৎ খুব বড়ো হয়ে গেছি মনে হতে থাকে। সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের 'একেবারে বাচ্চা' বলে মুখ বেঁকায়। ট্রামে-বাসে কেউ যদি আপনি না বলে তুমি বলে, তবে বিলক্ষণ চটে যাই। মাসতুতো বোনেদের নাইট শোতে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব, মাসীমা বললেন, এইটুকু ছেলের সঙ্গে কি এত রাত্তিরে ছেড়ে দেওয়া যায়? শুনে রাগে আমার শিরা-টিরা দপদপ করে।

কলেজে পড়ার সময় তো মনে হয়, এখন বড়ো হয়ে গেছি, সুতরাং বড়ো হয়ে কি হবো। ইতিমধ্যে কত রকম পরিকল্পনা যে বদলেছিলুম কিন্তু কলেজে এসে শুধু কলেজের ছেলেরা আর বড়ো হয়ে কি হবো—এই স্বপ্ন দেখে না, তারা ভাবে ভবিষ্যতের কথা, যার ডাকনাম কেরিয়ার। কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অধ্যাপক, কেউ রাষ্ট্রদূত। ছেলেবেলায় যেমন অনেক ছেলেকে দেখতুম ক্যারাম বা ডাংগুলি খেলে সময় কাটায়, এখানে এসে দেখলুম, সবাই ঐ রকম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার ছেলেখেলাতেই সময় কাটায়, কেউ আর বড়ো হতে চায় না। এই রকম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আমার ওসব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াও হলো না, অন্য স্বপ্নও ভুলে গেলুম।

তারপর সত্যি সত্যিই তো কলেজ টলেজ ছেড়ে এসে বয়েসে বড়ো হয়েছি, কিন্তু আর কিছুই হইনি। কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দুর্বোধ্য বা অনর্থক মনে হয়। যারা বার বার স্বপ্ন বদলায়, তারাই ভুল করে বোধ হয়।

ছেলেবেলায় যাকে দেখেছি, তখন থেকেই ঠিক করে রেখেছে, বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে, সে ডাক্তারই হয়েছে, আর কিছু হতেও চায়নি, হয়ওনি, কোনো দুঃখ নেই। বাবলু ডাক্তার হতে চেয়েছিল, সত্যিই ডাক্তার হয়ে বাবলু বেশ সুখী। মুরারির ইচ্ছে ছিল লেখক হবে, ক্লাশ সেভেন থেকেই আমাকে বলত, আমি রাইটার হবো, বুঝলি! ক্লাশ টেনে ওঠার আগেই মুরারি দুটো নাটক লিখে

ফেলেছিল, সগর্বে ঘোষণা করেছিল, দেখিস, একদিন আমি বড়ো রাইটার হবো। আমি ভক্তের মতো মুরারির দিকে তাকিয়ে থাকতুম। মুরারি এখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ বড়ো অফিসার হয়েছে, যথেষ্ট ডিএ বাড়ছে না, এ ছাড়া মুরারির আর কোনো দুঃখ নেই। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, ইতিহাসের ক্লাশে সুবিমল বলেছিল, আমি আর কিছু হতে চাই না, বড়ো হয়ে আমি নানান দেশ ঘুরে বেড়াব। সুবিমলের সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে দেখা হয়, একটা ওষুধের কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ হয়েছে, প্রায়ই দূরে নানান জায়গায় যেতে হয়। দেখা হলেই বলে কিরে, কেমন আছিস! চলি, বড়ো ব্যস্ত আছি, সন্ধেবেলা দিল্লি এক্সপ্রেস ধরতে হবে।

কখনো কখনো খুব অদ্ভুত লাগে! জানলার সামনে ঠক করে একটা কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি এসে পড়ল। আগে এই রকম ঘুড়ি দেখলে বুকের মধ্যে দুপ দুপ করত, একতলা থেকে তিনতলায় উঠে যেতুম বিদ্যুৎগতিতে, কতবার পড়ে গিয়েছি, থুতনিতে এখনো কাটা দাগ আছে। কালো চাঁদিয়াল তো ছিল দুর্লভ রত্ন, কিনতে না পেরে কতদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। আজ আমি উঠে একটু হাত বাড়ালেই ওঠাকে ধরতে পারি, কিন্তু কোনো ইচ্ছেই হলো না। দূর থেকে কতগুলো ছেলে ওটাকে নেবার জন্যে ছুটে আসছে, আমি হাসিমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছি। যে-ছেলেটা সবচেয়ে আগে আগে ছুটে আসছে, ওর মুখটা অনেকটা আমারই ছেলেবেলার মুখের মতন দেখতে না!

ছেলেবেলার এসব স্বপ্নগুলো কোথায় যায়? ছেলেবেলায় ভাবতুম, বড়ো হয়ে শুধু অফিসে চাকরি করা বা বিয়ে করে সংসার পেতে বাড়ি বানানো শুধু এই কি জীবন নাকি? এ তো নুন-কম তরকারির মতন, কোনো রকমে গিলে ফেলতে পারলে পেট ভরবে ঠিকই, কিন্তু বিস্বাদ থেকে যাবে। আসল জীবন অন্যরকম, কি রকম ঠিক জানি না, কিন্তু অন্য রকম। কিন্তু এখন দেখছি এইগুলোই তো সকলের একমাত্র সাধনার ধন। বড়ো হওয়া টড়ো হওয়া সব বাজে কথা, কোনোরকমে জীবনটা টিঁকিয়ে রাখাই বড়ো কথা।

৫

বুলুমাসিরা সবাই পুরী যাচ্ছেন, আমি ট্রেনে তুলে দিতে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, মানুষের দুঃখ আসলে দু'রকম।

বুলুমাসি বেশ পুষ্টাঙ্গিনী নারী—জাঁদরেল, দুনিয়ায় কাউকে ভয় করেন না,

মুখ-চোখের ভঙ্গি একরকম। আগে থেকে রিজার্ভ করা সিটে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। মাসতুতো ভাইবোন তিনজনই এখনো বাচ্চা, মেশোমশাইকেও একটি বাচ্চা হিসেবে ধরা যায়, কারণ পুরীতে এখন ঠাণ্ডা পড়তে পারে এই ভেবে তিনি হাওড়া স্টেশনেই সোয়েটার ও মাফলার পরে বসে আছেন। ট্রেন ছাড়তে এখনো মিনিট পঁচিশেক বাকি কিন্তু আমার এমন সাহস নেই যে, এখনি বুলুমাসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে পারি! ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে আর এক প্রস্থ পায়ের ধুলো নিতে হবে, বুলুমাসি আমার থুতনি ধরে আদর করার ছলে চোখ পাকিয়ে বলবেন সাবধানে থাকবি, বেশি রাত করে বাড়ি ফিরবি না, ঘুমোবার আগে ভালো করে দেখে নিবি দরজা-টরজা সব বন্ধ আছে কি না...ইত্যাদি, তবে তো নিষ্কৃতি!

সুতরাং আমি অলসভাবে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলুম। ছবির বইয়ের পাতা উল্টে যাবার মতন ট্রেনের এক-একটি কামরা দেখতে খুব ভালো লাগে। বিশেষত এই পুজোর সময়ে, কেননা এখন প্রত্যেক নারী ও শিশুর অঙ্গে নতুন ঝলমলে পোশাক। সারা ট্রেন জুড়ে কলকল্ খলখল্ করছে রামধনুর সাতটা রং। তবে গোলাপী রংটাই বেশি, এবারের পুজোর ফ্যাসান গোলাপী রং।

জানলাগুলোর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টুকরো কথাবার্তায় নানা ধরনের কাহিনী জানতে পারি। দুটি ছোট ঘটনার কথা বললেই বোঝা যাবে মানুষের দুঃখ আসলে দু'রকম।

--বাব-বাঃ, বাঁচা গেল। তা হলে সত্যি ট্রেনে উঠলুম—

—ধুৎ ভালো লাগছে না! এত ভেবে রেখেছিলুম—

—ললিতা, তুমি এখনো ঐ কথা ভেবে মন খারাপ করছ?

—করব না! কতদিন ধরে ভেবে রেখেছিলুম, বিয়ের পর কালিম্পং যাব -তা না, এখন চললুম ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে।

—মোটেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে নয়, পুরী খারাপ জায়গা?

—এই নিয়ে তিনবার যাওয়া হলো পুরীতে। পচে গেছে একেবারে।

—আহা, কালিম্পংই বা কি এমন ভালো জায়গা?

—খুব ভালো জায়গা। আমি কতদিন ধরে ভেবে রেখেছি। পুরী আর কালিম্পং বুঝি এক কথা হলো? ভেবে রেখেছিলুম, বিয়ের পরই তোমার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাব। পাহাড়ে আমার এত ভালো লাগে।

—কি করব, দার্জিলিং-এর ট্রেনের যে রিজার্ভেসান পেলাম না কিছুতেই। দেখো, দু'জনে এক সঙ্গে সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতেও ভালো লাগবে।

—সমুদ্র আমার ভালো লাগে না। রং কালো হয়ে যায়।

—ইস রঙের কি গর্ব।

এরপর যুবকটির উচ্চ ও যুবতীর স্মিত হাস্য। যদিও যুবতীর মুখে তখনো অখুশির ছায়া।

পরের দৃশ্য ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে। আবহাওয়া পারিবারিক। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে, দাদা-বৌদি, দিদি-জামাইবাবু, দাদার বন্ধু, বোনের বান্ধবী ইত্যাদি নিয়ে আটজনের একটি দল। জানালার পাশের রূপসী তরুণীটির মুখ মলিন, এক পলক দেখলেই বোঝা যায়, সে-ই এ দৃশ্যের নায়িকা। নায়িকা ছাড়া অন্যান্যদের সংলাপ আমি বিনা পরিচয়ে (ওদের পরিচয় তো আমি জানিও না। এলোমেলোভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি)।

—কি ব্যাপার, সুপর্ণার মুখ এমন গম্ভীর কেন?

—আহা বুঝতে পারছেন না? মন খারাপ!

নায়িকা : মোটেই আমার মন খারাপ নয়!

—কারুর সঙ্গে একটাও কথা নেই, চোখ ছল ছল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, একে মন খারাপ বলে না?

নায়িকা : মোটেই আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছি না। বয়ে গেছে আমার!

—কেন রে, সুপর্ণার মন খারাপ কেন রে?

—কল্যাণবাবু আসতে পারলেন না বলে আমাদের দিকেও একটু তাকাতে নেই।

—কল্যাণবাবু এলেন না কেন?

—সব তো ঠিকঠাক ছিল, লাস্ট মোমেণ্টে টেলিগ্রাম পেলেন ওঁর হেড অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কলকাতায় আসছেন, ওকে থাকতেই হবে।

—ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগুলোর কোনো আক্কেল নেই? পুজোর ছুটির সময়েও অফিসের কাজ! খালি কাজ আর কাজ!

—বোম্বেতে পুজোর ছুটি থাকে না। ওরা জানবে কি করে? তা ছাড়া কাজ না করলে কি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়া যায়?

—সত্যি অন্যায়, কল্যাণদার উচিত ছিল উল্টো টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেওয়া যে, উনি থাকতে পারবেন না! সুপর্ণাদি, তুমি জোর করে বললেই পারতে।

নায়িকা : আমার বয়ে গেছে। নিজেরই গরজ নেই। কাজটাই তো বড়ো।

—ইস, সুপর্ণার মুখখানা একেবারে টকটকে লাল হয়ে গেছে এক্ষুনি চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

নায়িকা : ঠাট্টা করবে না বলছি! ভালো হবে না।

—এই, কেন ওকে রাগাচ্ছিস! বিরহিনীকে একটু একা থাকতে দেওয়া উচিত!

—যা যাঃ! কল্যাণবাবুর অভাব তুই মেটাবি। দুধের স্বাদ কখনো ঘোলে মেটে?

—আমি মোটেই ঘোল নই, আমি কণ্ডেস্‌ড মিল্ক!

নায়িকা : ওরকম করলে আমি এখনি নেমে যাব বলছি!

—মনে তাইতো ইচ্ছে!

—এই, কেন তুমি সুপর্ণাকে রাগাচ্ছ?

—তোমার বুঝি অমনি হিংসে হলো। কল্যাণবাবু আসেননি, এই সুযোগে আমি একটু চান্স নিচ্ছি।

নায়িকা : এরকম করলে সত্যি নেমে যাব বলছি!

—নামো না দেখি, আমি দরজার কাছে বুক পেতে দেব না!

—আমার কি মনে হয় জানো ছোড়দি, কল্যাণদা হয়তো কাল পরশু পুরীতে হাজির হয়ে একটা সারপ্রাইজ দিতে পারে—

নায়িকা : এই রিণ্টু, তোরা একটু অন্য কথা বল না! খালি এই এক কথা! গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিতেই আমি আবার বুলুমাসির কামরার দিকে ছুটে এলাম। আস্তে আস্তে গাড়িটা প্লাটফর্ম ছেড়ে যাবার পর আমি সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। এই এক গাড়ি ভর্তি যারা যাচ্ছে, তারা অনেকেই যাচ্ছে সুখের সন্ধানে। সুখের চেহারা একরকম। দুঃখ দু-রকম। ঠিক জায়গায় যাওয়া হয় না. সব সময়েই দুটোর মধ্যে অন্তত একটা দুঃখ থেকেই যায়।

৬

ইংরেজিতে যদিও বলে কিং আর কুইন, কিন্তু মুখে আমরা এখনো বলি সাহেব-বিবি। কিন্তু, তাসের সাহেব-বিবির মতো সত্যিকারের ঐরকম সাহেব-বিবি আমি কখনো দেখিনি। ঐরকম গালপাট্টা গোঁপ, পাটকরা সিঁথি, কাশীর বেগুনের মতন মুখখানি, তাসের সাহেবের মতো ওরকম চেহারার সাহেব হয় কিনা জানি না। বাংলা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা টুয়েনটি নাইন, মাসিপিসিরা যারা ইংরেজি বিশেষ জানেন না—তাঁরাও দুপুরের দিকে গোল হয়ে খেলতে বসে পান চিবুতে চিবুতে কয়েকটা ইংরেজি কথা বলেন, যেমন খেলার নাম 'টুয়েনটি নাইন'—তা ছাড়া 'পেয়ার', 'ডবল', 'সেট'—ইত্যাদি, কিন্তু কিং কুইন নয়, সাহেব-বিবি থাকে সাহেব বিবিই। এমনকি, 'বিবির পেয়ার' দেখালে চার নম্বর কমে যায়, কিন্তু 'কুইনের পেয়ার', কখনো শুনিনি। রাজা-রানী আর নেই কিন্তু বাংলা দেশের তাসে সাহেব-বিবি রয়ে গেলেন। ঐ রকম অদ্ভুত চেহারায়!

ছেলেবেলায় আমি এই নিয়ে প্রায়ই ভাবিত হয়ে পড়তাম। তাসের সাহেবের

ঐরকম অ-সাহেবী চেহারা দেখে। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি, সাহেবরা মত্যিকারের বহুরূপী, মানুষ থেকে অমানুষ সব রকম চেহারাই ওরা ধরতে পারে —গায়ের রংটা সব সময় ফর্সা থাকে, এই যা। প্রায়ই বহু সাহেব আমার চোখে পড়ে, অনেকেরই সংস্পর্শে আসতে হয় এই কলকাতা শহরেই।

আমার জীবনে প্রথম সাহেব দর্শন এবং স্পর্শন ঘটে ছেলেবেলায়। গাঁয়ের ছেলে, শহরে এসেছি পড়তে। ১৯৪৬ সাল। কী এক উপলক্ষে স্কুলে স্ট্রাইক, অন্য ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে আমিও শোভাযাত্রায়। ইউনিভার্সিটির সামনে মিটিং, খুব গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছে, এমন সময় পুলিশ এসে গেল। কোথায়, কোনদিকে ছুটে পালাতে হয় আমি তখনো জানি না, একই জায়গায় ঢ্যালার মতন দাঁড়িয়ে আছি, একটি সারজেন্ট এসে (সে পুরো সাহেব বা আধা কিংবা পৌনে ছিল জানি না, কিন্তু তার লাল টকটকে চেহারা ছিল ভয়াল সাহেবেরই প্রতিমূর্তি!) 'হট যাও' বলে আলতোভাবে ছুঁয়ে দিল, আমি ছিটকে পড়লুম, আমার চোখের কোণে সেই কাটা দাগ আজও আছে। তখন ভেবেছিলুম বড়ো হয়ে সাহেবদের ওপর খুব একটা প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু, তার এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা এসে গেল, আর সাহেবগুলো এমন বদলে গেল! স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে এ পর্যন্ত একজন শ্বেতাঙ্গকেও তাঁর গায়ের রং বা জাতি পরিচয়ের জন্য অপদস্থ করা হয়েছে এরকম উদাহরণ নেই। এই সহনশীলতা আমাদের দেশের বিশেষত্ব নিশ্চিত। ফরাসিরা এখনো সহ্য করতে পারে না জার্মানদের। কোরিয়ার লোক এখনো জাপানিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি নয়, কিন্তু ইংরেজদের ওপর আমাদের পুরোনো রাগ একটুও নেই।

এই শীতকালে, যখন মানস সরোবর কিংবা আরো দূরের শীতের দেশ থেকে উড়ে আসে হাজারে হাজারে যাযাবর হাঁস, আশ্রয় নেয় চিড়িয়াখানায়—তেমনি কলকাতা শহরেও আসতে থাকবে ঝাঁকে ঝাঁকে সাহেব। চৌরঙ্গি এলাকায় পথঘাট ভরে যাবে সাহেব-মেমে। কিন্তু যাদের কথা সকলেই জানেন, যাঁরা এসে ওঠেন এক নম্বর হোটেলগুলোতে, ফুল ফুল ছাপ জামা এবং কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দৈত্যের মতো চেহারার যে সব সাহেব, পাশে রঙিন খাঁচার মতো পোশাক পরা ছোট ফুরফুরে মেমসাহেবকে নিয়ে ছবি তুলে বেড়াবেন, বিরাট গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবেন কোনারক দেখতে—যাঁরা আমাদের দেশের পক্ষে বড়ো আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাঁদের সরকারি নাম 'ট্যুরিস্ট', যাঁরা এসে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ বৃদ্ধি করেন, তাঁরা ছাড়াও আরো অনেক চেহারার সাহেব-সুবো আসেন এদেশে। তাঁদের সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আঠারো থেকে তেইশ বছর বয়সের মধ্যে ইওরোপে আমেরিকার বহু ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে পড়ে পৃথিবী ভ্রমণে। অনেকরকম স্কলারশীপের ব্যবস্থা আছে, যারা

সেই স্কলারশীপ পেয়ে যায়, তারা সৌভাগ্যবান, যারা পায় না, তারাও দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের বাংলা কাগজে মাঝে মাঝে ছবি বেরুত শ্রীযুক্ত অমুক পায়ে হেঁটে পৃথিবী ভ্রমণ করে এলেন বা করতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এই রকম দুঃসাহসিক কাজ খবরের কাগজে ছবি বেরুবার মতো। অথচ, ইউরোপ আমেরিকা থেকে প্রতি বছর হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে পায়ে হেঁটে পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বছর দু-তিন আগে, শোনা যায়, কবি অ্যালেন গীনসবার্গ ইউরোপ থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন কলকাতায়। এরকম আরো অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

বছর চারেক আগে, মৌলালির কাছে একজন ইংরেজ যুবক আমাকে জিজ্ঞেস করল, রিপন স্ট্রিট কোথায় বলতে পার?

বললুম, আমি অনেকটা এ দিকেই যাচ্ছি, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি।

যেতে যেতে আলাপ হলো। ছেলেটা এসেছে ইংলণ্ডের সাসেক্স অঞ্চল থেকে, কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ মন খারাপ হওয়ায় পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে। কার মুখে যেন শুনেছে রিপন স্ট্রিটে সস্তায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়, তাই খুঁজতে যাচ্ছে। নাম স্ট্যানলি, বছর কুড়ি বয়েস, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, কোমল মুখ নীল চোখ। খানিকদূর এগিয়ে আমি বিদায় নিলাম। দিন সাতেক পরে সেই ছেলেটাকেই আবার দেখলুম চৌরঙ্গি অঞ্চলে। জামাকাপড় ময়লা, চুল উস্কোখুস্কো, পিঠে একটা ব্যাগ। নিজে থেকেই ডেকে বললুম, কী খবর, স্ট্যানলি? একটু ফ্যাকাসে ধরনের হেসে বলল, তোমার চেনা কোনো জায়গা আছে, যেখানে বিনা পয়সায় থাকা যায়?

আমার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি নিজের বাড়িতে একা থাকতেন। তিনি বললেন, তুমি আমার বাড়িতে থাকতে পার!—

স্ট্যানলি সানন্দে বন্ধুটির সঙ্গে চলে গেল। মাসখানেক পরে সেই বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি, স্ট্যানলি তোয়ালে পরে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, বন্ধুটি তখন বাড়িতে নেই। অপেক্ষা করতে করতে শুনলাম স্ট্যানলির তখন খাবার পয়সা নেই, বন্ধুটির সঙ্গেই খায়—এবং প্রতিদিনে নিজে থেকেই ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, জামাকাপড় কাচে। বন্ধুটিকে পরে বললুম, কি রে, ব্রিটিশ চাকর রেখেছিস যে বাড়িতে? বন্ধু লাজুকভাবে বললেন, ছেলেটা সত্যি ভালো, টাকাপয়সা নেই, বিপদে পড়েছে, থাক না...তবে, রাত্তিরে যখন ঘুমের ঘোরে ওর গায়ে পা তুলে দিই মাঝে মাঝে—তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে পায়ের তলায় একজন খাঁটি

ইংরেজ শুয়ে আছে, ভাবলে হাসিই পায়।

স্ট্যানলি আরো অনেকদিন রয়ে গেল আমাদের আড্ডায়, ওকে নিয়মিত সদস্যরূপে পেলাম। সরল, বুদ্ধিমান ছেলে, অনিন্দ্যকান্তি, কথায় কথায় ঝরঝর করে হাসে। দুনিয়ার কোনো বিষয় সম্পর্কে কুসংস্কার নেই, এমনকি নিজের দেশ সম্পর্কেও। তারপর একদিন ও হঠাৎই আবার চলে গেল।

মাস কয়েক পর, একদিন বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি আমার বিছানায় তিনটে সাহেব শুয়ে আছে। শুনলাম সন্ধে থেকে ওরা আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। একজন বেশ সপ্রতিভাবে বলল, তোমার নাম ওমুক তো? তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

আমি একটু ঢোঁক গিলে মনে মনে ভাবলুম, এতই বিখ্যাত হয়ে গেছি নাকি যে, ইউরোপ-আমেরিকা থেকে সাহেবরা আমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসছে? সন্ধে থেকে বসে থাকছে মাঝরাত পর্যন্ত। ওরা বলল, এলাহাবাদে স্ট্যানলি বলে একটি ব্রিটিশ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। সে তোমাদের কয়েকজনের ঠিকানা দিয়ে বলেছে তোমরা কলকাতায় থাকার জায়গা জোগাড় করে দিতে পার।

শুনে আশ্বস্ত হলাম। তিনজনের মধ্যে দুজন আমেরিকান, একজন ইংরেজ। পথে পথেই ওদের বন্ধুত্ব। ভরাট স্বাস্থ্য, সবল কণ্ঠস্বর, লাল চুল, নীল চোখ, কিন্তু সাহেব-ভিখিরি। ছেঁড়া ঝুলি ঝুলি জামা-প্যান্ট, কারুর পায়ে রবারের চটি কারুর খালি পা। শিক্ষা-দীক্ষা-বুদ্ধিতে কেউ খুব সাধারণ নয়। আমার চেয়ে আমার যে বন্ধু একা থাকেন তাঁর বাড়িতেই এরকম ভিখিরি সাহেব অতিথি আসতে লাগল ঘন ঘন।

একজোড়া ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো, আমেরিকান। দু'জনেরই বয়স কুড়ির নীচে—ঐরকম কবে কোথায় থাকবে ঠিক নেই, ঘুগনি-আলুকাবলি কিংবা বেশি করে তরকারি ফাউ নিয়ে দু'আনার কচুরি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ছেলেটার চোখের কাছে একটা কালসিটের দাগ। জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কিসের জন্য? ছেলেটা হাসতে হাসতে বলল, ও কিছু নয়। কাশীতে এক সন্ধেবেলা চারটে মজার লোক—কি যেন তোমরা বলো, গুণ্ডা? গুণ্ডা?—গলির মধ্যে আক্রমণ করেছিল—ওদের ইচ্ছে ছিল আমার বান্ধবীকে কেড়ে নেয়। তাই ওদের সঙ্গে একটু খেলা করলুম আর কি!

আমরা শিউরে উঠে বললুম, কী সর্বনাশ! কাশীর গুণ্ডা? বাঁচলে কি করে?

ছেলেটা হাসতে হাসতে বলল, আমি যুযুৎসু জানি কিনা! চারটে লোককে সামলানো আমার কাছে কিছুই না। একজনের যেই একটা চোখ কানা করে দিলুম, অমনি আর সবাই ভয়ে পালাল।

এস্থার বলে আর একটি মেয়েকে দেখেছিলুম, সে এসেছিল একা। আঠেরো উনিশ বছরের মেয়ে, লম্বা চুল, নরম স্বভাব, বিয়ে পাশ করে একা বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে। ও ঠিক পায়ে হেঁটে ঘোরে না, হিচ হাইকিং—অর্থাৎ রাস্তার চলতি গাড়ি থামিয়ে বিনে পয়সার লিফট চায়! কলকাতা থেকে ঐভাবে মাদ্রাজে যাবে। আমি ভয় পেয়ে বললুম, তুমি একা মেয়ে, যে কোনো অচেনা লোকের গাড়িতে উঠবে—তুমি তার বিপদের কথা জানো না? ট্রাক ড্রাইভাররা বোধহয় সব দেশেই সমান হয়—অন্তত এ দেশের লরির ড্রাইভারদের কথা জানি—তাদের নিষ্ঠুরতার সীমা নেই।

নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সরল হেসে এস্থার বলল, জানো—আমার কখনো বিপদ হয় না। আমার সঙ্গে যখন কেউ খারাপ ব্যবহার করতে আসে, আমি তার পা জড়িয়ে ধরে দয়া ভিক্ষা চাই। এমন কাঁদতে আরম্ভ করি—যে শেষ পর্যন্ত তারা দয়া না করে পারে না।

বহুদিন পরে এসথারের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম যে, সে নিরাপদেই দেশে ফিরতে পেরেছে।

কিন্তু সবচেয়ে মজার সেই জার্মান ছেলেটি, যে এখনো কলকাতায় আছে। ধরা যাক তার নাম গটফ্রিড। জার্মানিতে ওর বাবা একজন ডাক্তার, সুতরাং ধরা যায়, উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। কিন্তু গটফ্রিড একেবারে ভিখিরি—পাশপোর্ট ছাড়া আর কোনো মূল্যবান বস্তু ওর সঙ্গে নেই। আমার নানা বন্ধুর বাড়িতে ও কিছুদিন করে রইল। কিন্তু ভিখিরি হলেও খানিকটা সৌখিন ও অভিমানী বলে বেশিদিন থাকতে পারে না। এক বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন ছিল, কিন্তু তার ঘরে মাঝে মাঝে ইঁদুর ঢোকে বলে বেশিদিন থাকতে পারেনি। আরেকজনের বাড়িতে আবার বেড়াল আছে, তাও ওর পছন্দ নয়। শুনেছি জার্মান জাত বিষম কর্মঠ হয়। কিন্তু একজনের বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার জায়গা পেয়ে সে শুধু দিনরাত শুয়ে থাকে কিংবা ছবি আঁকার নামে হিজিবিজি কাটে। সেখান থেকে ও চলে গেল একদিন। মাঝখানে শুনলুম গটফ্রিড রাস্তায় নাচ দেখিয়ে ভিক্ষে করছে। সাহেবের নাচ দেখলে কলকাতার লোক এখনো ভিক্ষে দেয় বোধহয়।

আমার সেই যে বন্ধু একা থাকেন, একদিন তাঁর কাছে রাত দশটায় গটফ্রিড এসে হাজির। খুব ব্যস্তভাবে বলল, এই, তোমার কাছে একটা কম্বল আছে?

—কেন, কম্বল কি করবে? কোথায় থাক তুমি এখন?

—সময় নেই, তাড়াতাড়ি। কম্বল আছে কিনা বলো।

—আছে, দিচ্ছি। কোথায় থাক?

—চমৎকার জায়গায়। চৌরঙ্গিতে ময়দানে। পাশেই পুকুর, তার পাশে ছোট

একটা গুমটি ঘর আছে। কি আলো হাওয়া ঘরটায়। আর চৌরঙ্গির মতো জায়গায় বেড়াল নেই, ইঁদুর নেই, ফার্স্ট ক্লাশ। কিন্তু ক-দিন ধরে একটু শীত-শীত করছে। একটা কম্বল দরকার! তাড়াতাড়ি দাও নইলে ভিখিরিরা এসে জায়গাটা আবার দখল করে নেবে।

৭

এতকাল কলকাতা শহরে আছি, কোনোদিন জ্যোৎস্না দেখিনি। আকাশের দিকে তো চোখ তুলে তাকাবার স্বভাব নেই, ছেলেবেলায় সেই যখন ঘুড়ি ওড়াতুম —তারপর আর কখনো আকাশের দিকে পুরো চেয়ে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। জ্যোৎস্নাও দেখিনি, জ্যোৎস্নার আলো নিয়মিত নিশ্চিত এসেছে কলকাতায়, কিন্তু নিয়ন আলোয় মিশে গেছে, মিশে গিয়ে অন্যরকম রং, বড়োই ফ্যাকাশে বা অদৃশ্য। যাই হোক, আমি জ্যোৎস্না নিয়ে বহুদিন ভেবেও দেখিনি।

গত শুক্কুরবার পূর্ণিমা ছিল। তার চারদিন আগে থেকে কলকাতা শহরে ব্ল্যাক আউট। ক'দিন থেকেই দেখেছি রাস্তায় একটিও আলো নেই, তবু কোথাও পুরো অন্ধকার নয়। কি রকম যেন একটা অন্য রকমের আলো এসে পড়েছে এখানে সেখানে—। তবুও আকাশে মুখ তুলিনি। হঠাৎ পথে পথে শুনতে পেলাম শুক্কুরবার দিন পূর্ণিমা। কে আবার কবে পূর্ণিমার খোঁজ রেখেছে? কত পূর্ণিমা আসে, কত পূর্ণিমা যায়—যাদের বাতের অসুখ আছে, তারা ছাড়া আর কেউ পূর্ণিমার খবরও রাখে না। এমনকি, কবিরাও নয়, আজকাল। অথবা শুধু সেই সব কবি যাঁরা বাতের রোগী।

তবে কেন কলকাতার পথে পথে হঠাৎ পূর্ণিমার আলোচনা?

কান পেতে শুনলাম, পূর্ণিমার দিনই নাকি বোমা পড়ার সম্ভাবনা। সেদিন ব্ল্যাক আউট তুচ্ছ হয়ে যায়, সেদিন আর কিছুই গোপন রাখবার উপায় নেই, কারণ, চাঁদে ঠুলি পরানো যায় না। সেই জন্যই শুধু লোকে পূর্ণিমার আলোচনা করছে? অথচ লোকের মুখে তো ভয় নেই। কেউ তো বোমা পড়ার ভয়ে মুখ শুকনো করেনি।

শুক্কুরবার দিন সন্ধের পর আমি বিশেষ কাজে দ্রুত হেঁটে আসছিলুম। যতক্ষণ নিজের চিন্তা নিয়ে বিব্রত ছিলুম, ততক্ষণ কিছুই চোখে পড়েনি। হঠাৎ এক সময় দেখলুম, রাস্তাটা নীল রঙে ছেয়ে গেছে। নীল রঙের জ্যোৎস্না—নীল রং, যে জ্যোৎস্নায় অভিসারে বেরুবার সময় রাধা আত্মগোপন করার চেষ্টায় নীল রঙের শাড়ি পরে নিজেকে মিশিয়ে দিত জ্যোৎস্নায়। আমি অকস্মাৎ কিছু না ভেবে

তাকালুম আকাশের দিকে। দেখি চৌরঙ্গির শিয়রে বিশাল চাঁদ উঠেছে ঠিক ইয়ের মতো। কিসের মতো? কিসের মতো? না থাক, চাঁদ নিয়ে বহু উপমা দেওয়া হয়েছে, অসংখ্য, আমি না হয় আর একটা উপমা নাই-বা যোগ করলুম। বরং বলা যাক, চাঁদ উঠে আছে ঠিক চাঁদের মতো। বহুদিন চাঁদ দেখিনি, সুতরাং চাঁদই আমার কাছে চাঁদের উপমা।

আর একটা কথাও মনে হলো, এ চাঁদ শুধু কলকাতাতেই উঠেছে।

চৌরঙ্গির শিয়রের কাছে এই যে ফুটে আছে বিশাল চাঁদ, ওর পক্ষে ঠিক এখনই আর কোথাও আলো দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই যে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ শশাঙ্ক, একে নিয়ে এখন আমি কি করি? মহা মুস্কিলে পড়লুম, এতদিন পর এমন ভাবে দেখলুম চাঁদকে, কিছু যেন একটা আমার করা দরকার সেই উপলক্ষে। অথচ কী? একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলুম। শুক্কুরবার সন্ধেবেলা আমার জরুরি কাজ থাকে, অনেকদিন নানা কারণে আটকে গেছি, কিন্তু কোনো দিন এমন নৈসর্গিক বাধা আসেনি। শেষ পর্যন্ত, পূর্ণ চাঁদের মায়া আমার ভাবনার পথ ভোলাতে পারল না, আমি মুখ নিচু করে জরুরি কাজ সারতে চলে গেলুম।

ঘণ্টা দুয়েক পর, দশটা বাজে, আমরা চার বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছি আবার চৌরঙ্গির মোড়ে। আমরা ভাবছি, এখন আমরা কোনদিকে যাব। মাথার উপরে চাঁদ। আমরা চারজন রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতিপুত্র, কোটালপুত্র নই যে চৌরাস্তার চারদিকে চলে যাব। আমরা সবাই এক রাস্তায় যাব, যে-যার বাড়িতে যাব—কিন্তু তার আগে এই চাঁদকে কি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাব? চাঁদের ফ্লাড লাইট কলকাতার ব্ল্যাকআউট নষ্ট করে দিয়েছে। চারদিক আলোময়। এতদিন চন্দ্রবিহীন ছিল বলেই আজ এ শহরে চাঁদ তার সমস্ত আলো উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে নাকি? অথবা প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই এমন চাঁদের আলো থাকে, আমরা দেখতে পাই না? তাহলে, আমাদের মনে হলো, যুদ্ধ একদিন না একদিন থামবেই আমাদের অনুকূলে, তখন, যুদ্ধ থেমে যাবার পর, এই কলকাতা শহরে প্রত্যেক পূর্ণিমার দিন তো পথের সব আলো এমনিতেই নিভিয়ে দিলে হয়! কোনো দরকার নেই বালবের আলোর, নিয়ন রঙের আলোর, মাসে অন্তত একদিন অন্যরকম আলো থাক না—এই শহরে। নগরের সব মানুষ সেদিন বেরিয়ে আসবে পথে, মাসের একটি দিন এ শহরে অঘোষিত উৎসব হবে। ফলে, বিদ্যুৎ বাঁচবে, বাঁচবে মানুষের সুকুমার বৃত্তি। যদি কেউ কেউ এর ফলে চন্দ্রাহত হয়ে যায়, তবু ক্ষতি নেই। দিনের আলোয় পাগল হওয়ার চেয়ে রাত্তিরে পাগল হওয়া ভালো।

আমরা চার বন্ধু ঠিক করলুম, আজ রাত্রে আমরা এক শতাব্দী পিছনে ফিরে যাব। চোখে পূর্বপুরুষদের রোমান্টিকতা মাখিয়ে আজ আমরা পথের ওপরেই

দাঁড়িয়ে কিছুটা চন্দ্রাসুধা পান করব। কেউ আমাদের অনাধুনিক বলতে পারবে না, চিনতেই বা পারবে কে? চাঁদের আলোয় আমাদের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। আমরা চারজনে ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদের দিকে তাকালুম।

পথে লোক নেই। যে দু' চারজন ইতস্তত ঘুরছে দেখলুম, মনে হলো, ওরাও যেন লুকিয়ে চাঁদের সুষমা ভোগ করতে এসেছে। কোথাও বিন্দুমাত্র সন্ত্রস্ততা নেই। দূরে অক্টরলোনী মনুমেণ্টটাকে প্রত্যেকদিন আমার অসহ্য কুৎসিত লাগে দেখতে, স্থাপত্য শিল্পের চরম কদর্যতার এই নিদর্শনটি কলকাতার বুকে এখনো আছে দেখে প্রত্যেকদিন আমার রাগ হয়, কিন্তু আজ দেখলুম, চাঁদের আলোয় ও একেবারে বদলে গেছে। শান্ত, গম্ভীরভাবে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হলো, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মনুমেণ্টটাও ওর দুটো হাত বার করে এক একবার মাথা চুলকে নিচ্ছে—যেন ঘুম না পায়। মন্থর পায়ে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করেছি। চাঁদের আলোয় পায়ের শব্দ হয় না। কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো ছায়া পড়ছে।

সারা শরীর ভিজে গেছে চাঁদের আলোয়। চুলের মধ্যে জ্যোৎস্না, হাতে মুখে, জামার পকেটে ঢুকে গেছে জ্যোৎস্না। এত তীব্র নীল আলোয় যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লুম। হেঁটে চলেছি, হেঁটেই চলেছি বহুদূর, নিঃশব্দে। দুটো বিড়ালের বাচ্চা খেলা করছিল পথের ওপর। সেখানে একটা গাছের ছায়া পড়েছে একটু একটু, আলো আর ছায়ার মধ্যে খেলা করছে দুটো বিড়ালের বাচ্চা, দুজনে দুটোকে জড়িয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওদের দেখে আমরা একটু থমকে দাঁড়ালুম, জ্যোৎস্নায় মিশে গেছে দুটো ফুটফুটে বিড়াল, গাছের ছায়ায় যখন আসছে তখনই ওদের চোখ দেখা যায়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো, এই জ্যোৎস্না ও শিরীষ গাছের পাতার ছায়া, দুটো বিড়াল শাবকের সামনে আমরা চারজন...এই চমৎকার পরিবেশে একটা সিগারেট না ধরালে মানায় না। দেশলাইতে একটাই কাঠি ছিল। কাঠিটা জ্বলে ওঠবার পরেই বুঝতে পারলুম, জ্যোৎস্না কত সুন্দর।

তখন ইচ্ছে হলো গুনগুন করি। চাঁদ সম্পর্কে কার কি গান মনে পড়ে? প্রথমেই মনে এল, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে'। এই গানে যেন মুহূর্তে আমাদের কৈশোর ফিরে এল, কারণ কৈশোরের পর আর এ গানটা শুনিনি। গানটা গুনগুন করতে করতে মাঝখানে আমরা চারজনেই এক সঙ্গে হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠলুম। কে কি ভেবেছিলাম কি জানি! তারপর, মনে পড়ল, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' কিন্তু দু' তিন লাইনের পরই চুপ করে গেলাম। এ গানটা মানায় না, সবাই গেছে বনে—এখানে সবাই বলতে চারজন পুরুষ নয় নিশ্চয়ই। আমাদের এ গানটা মানায় না। আর কি গান? 'ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার'

—এ গান এক লাইনও গাওয়া যায় না। 'চোখের জল' আমাদের কোনো ব্যাপার তো নয়, বিশেষত 'দুঃখের পারাবারে' বড়োই কাঁচা রচনা।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বহুদূর চলে এসেছি। পৌঁছোলাম আর এক চৌরাস্তায়। এবার আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একজন বলল, চলো এবার ডানদিকে যাই। আরেকজন বলল, না, বাঁ দিকে, ওদিকটা বেশ ফাঁকা। আরেকজন না, চলো সামনের দিকেই যাই, তাহলে বাড়ির দিকেই পৌঁছে যাব। চতুর্থজন—না, চলো পিছনে ফিরে যাই, আবার ফিরে যাই চৌরঙ্গিতে। ওখানটাই সবচেয়ে সুন্দর। আমাদের মতের মিল হলো না। তখন ঠিক করলুম একটা পয়সা নিয়ে টস্ করা হোক দু'জন দু'জন করে। একটা চকচকে আধুলি বার করলুম পকেট থেকে। আধুলিটাতে একটা টুসকি মেরে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলুম, সেটা ঠং করে মাটিতে পড়ল। আমি আমার পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম, বল হেড না টেল?

একজন কৌতূহলী পথচারী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বোধহয় সে আমাদের কথা শুনেছিল। হঠাৎ লোকটি আমাদের কাছে এসে বলল, বাড়িই চলে যান! এত রাত হলো! আমরা এমন চমকে উঠেছিলাম যে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

—না বলছিলাম কি, আপনাদের কথা শুনলাম তো, কোন দিকে যাবেন? এখন বাড়ি যাওয়াই ভালো।

মধ্যবয়স্ক ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকটি, কালো হাতির মতো মুখ, কিন্তু চোখ দুটি দেখলে নিরীহ ভালোমানুষ বলেই মনে হয়। বোধহয় রাত্তিরের ভাত হজম করার জন্য পায়চারি করতে বেরিয়েছেন। তবু, এ সময় যে-কোনো অপরিচিত লোকের গায়ে পড়ে কথা বলাই সন্দেহজনক। জিজ্ঞেস করলুম, আপনি?

—না, না, আমি এমনিই বললুম এত রাত্রে আর কোথায় ঘুরবেন, এখন বাড়ি যাওয়াই ভালো, তাই,—

—আপনি কোথায় থাকেন?

—ঐ যে কোণের বাড়িটা। 'শান্তা লজ'—ঐ বাড়িটা আমার।

ভদ্রলোক হাতের ছড়িটা উঁচু করে দেখালেন। ভদ্রলোকের মুখে সন্দেহজনক কিছুই নেই তবু জিজ্ঞেস করলুম, আপনার নাম?

—শশধর রায়চৌধুরী।

—কি রায়চৌধুরী? শশধর?

আমি হাসি সামলাতে পারলুম না। একটু দূরে গিয়ে হে-হো করে হেসে উঠলুম। এক বন্ধু এসে বলল, কি রে হাসছিস কেন? আমি বললুম, কিছু না! —বল না!—আমি হাসি গিলে ফেলে বললুম, এতক্ষণ চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। এখন স্বয়ং শশধর এসে পথনির্দেশ করে দিলেন। চল বাড়ি যাই।

বৃদ্ধ খেয়ার মাঝি তার নৌকোখানার ওপর একলা চুপ করে বসে আছে। লোকজনকে ডাকাডাকি করার ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই। বয়সের দরুণ চোখে ছানি পড়েছে, ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে সে জলের মধ্যে কি দেখছে কে জানে।

পাশেই চালু হয়েছে স্টিমার ফেরি! শস্তা ও দ্রুত, সব লোক আজকাল তাতেই যায়। খেয়া নৌকোর দিন শেষ হয়ে গেছে। তবু বৃদ্ধ কাশেম আলি তার ছোট নৌকোখানা নিয়ে বসে থাকে অভ্যেসবশত। কখনো কখনো স্টিমার ফেরি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য বন্ধ থাকে—কখনো দু-তিন ঘণ্টা লেট হয়—তখন কাশেম আলির খেয়ার নৌকোয় কেউ কেউ আসে।

—কি কাশেম ভাই, আমাকে চিনতে পার?

খেয়ার মাঝি নড়েচড়ে বসে। মুখে একটা হাসির আভাস দেখা দেয়। বলে, যাবেন ওপারে? আসেন। এক আনা। এক আনা।

—চিনতে পার আমাকে?

—হ হ ক্যান চিনুম না।

সে আমার দিকে ভালো করে তাকায়। একটু লজ্জা গোপন করার চেষ্টা করে। সে আমায় চিনতে পারেনি। চিনতে পারার কথাও নয়।

আমিও কাশেমকে চিনতে পারিনি। পঁচিশ বছর পরে একজন মানুষকে চিনতে পারা কি সহজ?

পঁচিশ বছর আগে আমি নিতান্তই বালক। কয়েকবার তখন এই নদীর ওপর দিয়ে খেয়া পারাপার করেছি। হয়তো তখন কাশেম আলি ছিল না—ছিল অন্য কেউ। কিন্তু খেয়ার মাঝি তো একটা প্রতীক। মনে হয় যেন আবহমান কাল ধরে একজন মাঝিই খেয়া পারাপার করে যায়।

তবু বাল্যের দু-একটা স্মৃতি অদ্ভুতভাবে মনের মধ্যে গেঁথে থাকে। অনেক প্রিয় মুখ ভুলে গেছি, তবু মনে থেকে গেছে একটা দৃশ্য—খেয়া নৌকোর একজন মাঝি, শুধু লুঙ্গি পরা খালি গা—লম্বা-চওড়া জোয়ান, মুখে ঝকঝকে হাসি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি চালাবার সময় তার বাহুর সবল পেশিগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তাকে মনে হয়েছিল সে এই নদীর অধিপতি—এত স্বচ্ছন্দ তার খেয়া পারাপার। সম্ভবত ভাটিয়ালি গানের দু-এক পদও শোনা গিয়েছিল তার কণ্ঠে।

পঁচিশ বছর বাদে সেই নদীর ধারে এসে অকস্মাৎ মনের মধ্যে ঝিলিক দেয় দৃশ্য। এখন স্টিমার ফেরি হয়েছে, খেয়া নৌকোর আর কদর নেই। তবু স্টিমারে পার হওয়ার বদলে আমি খেয়া নৌকোর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মাঝির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এই কি সেই? হতেও পারে, নাও হতে পারে। কোথায় সেই দুর্ধর্ষ জোয়ান, যাকে মনে হয়েছিল নদীর অধিপতি। পঁচিশ বছর পর তার বৃদ্ধ

হয়ে যাবারই কথা। এবং এখন আর সে নদীর অধিপতি নয়—এখন যন্ত্র এসে গেছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। পাড় থেকে কেউ একজন মাঝিকে একবার কাশেম আলি বলে ডাকল—সেই থেকে জেনে নিলাম নাম। পঁচিশ বছর আগে যে ছিল তার নামও কাশেম আলি কিনা আমার মনে নেই। তবে, খেয়ার মাঝি যেন একটা প্রতীক—যেন একই মানুষ চিরকাল খেয়া পারাপার করে। সেই জন্যই প্রশ্ন করি, কি কাশেম ভাই, চিনতে পার?

বারবার তো এই নদী, এই প্রকৃতি, এইসব মানুষকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, চিনতে পার? চিনতে পার? এটা সেই পঁচিশ বছর আগেকার বালকের প্রশ্ন। কেন না, এখনকার আমি-কে চিনতে পারা সম্ভব নয়, আমি অনেক বদলে গেছি।

এই নদীর কিনারায় আমি এখন একই সঙ্গে একজন বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আমার মনের একটা অংশ ফিরে গেছে শৈশবে, একটা অংশ বর্তমান বাস্তবে। একটা অংশ সব কিছু অবাক চোখে দেখে, একটা অংশ বিচার-বিবেচনা করে।

আমি কাশেম আলির নৌকোয় উঠলাম। আমি ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। স্টিমার ফেরি চালু আছে, কে এই পলকা খেয়ায় উঠবে। শুধু আমাকে নিয়ে মাত্র এক আনা পয়সার জন্য কাশেম আলি নদী পার হবে—এটা ভারি আশ্চর্য লাগে। কিন্তু কাশেম আলির কোনো অভিযোগ নেই, বরং তাকে খুশিই মনে হয়। শুধু শুধু বসে থাকার বদলে বৈঠা চালানোতেই সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

একটু আগে কাশেম আলিকে বিড়ি খেতে দেখেছিলাম। তাই নিজে সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাকেও একটা দিই। এটা এক হিসেবে অসৌজন্য, কারণ পঁচিশ বছর আগে আমি যদি একেই দেখে থাকি, তাহলে কাশেম আলি আমার গুরুজন তুল্য, তাঁর সামনে ধূমপান করাই আমার উচিত নয়। কিন্তু আমার ভেতরের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষটি এদিকটা পাত্তা দেয় না।

কাশেম আলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিগারেটটি দেখে। তারপর, জিজ্ঞেস করে, কর্তা কি বাংলাদেশী, না ইণ্ডিয়া থিকা আইতাছেন?

উত্তর দেবার আগে আমি মনে মনে একটু হাসলুম। দু পাঁচ বছর বাদে হয়তো এসব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখনো আমার মধ্যে একটু আলোড়ন জাগে। যে মাটিতে জন্মেছি, যেখানে শৈশবে গায়ে ধুলো মেখেছি, যে নদীতে খেয়া পারাপার করেছি—সেই মাটি ও সেই নদীর ওপর বসে নিজেকে বিদেশী বলে পরিচয় দিতে গেলে একটু হাসি পাবে না?

পঁচিশ বছর আগে যখন দেশ স্বাধীনও হয়নি, ভাগও হয়নি—তখন গ্রামের

সাধারণ চাষী বা খেয়ার মাঝির মুখে ভারত বা ইণ্ডিয়া কথাটাই শোনা যেত না। তখন ওরা জানত শুধু এই জেলা আর ঐ জেলা, এই নদী আর ঐ নদী। বড়ো জোর ঢাকা আর কলকাতার গল্প শুনেছে। অবাঙালি মাত্রই ছিল তখন 'পশ্চিমা'। এখন সবাই দেশ বোঝে। এটা ভালো কথা।

বললাম হ্যাঁ, আমি ইণ্ডিয়ার লোক। তবে, এখানেও ছিলাম ছোটবেলায়। কাশেম আলি চুপ করে বৈঠা টানতে লাগল। বুড়ো হয়েছে, হাতে আর সে রকম জোর নেই। নদীর জল বেশ টলটলে, নীল আকাশের ছায়া পড়েছে। মনে হয়, এই জল খুব চেনা—পঁচিশ বছর আগে ঠিক এরকমই দেখেছি। কি-রি-কি-রি-কি-রি শব্দ করে যে মাছরাঙা পাখিটা ঝুপ করে জলে এসে পড়ল, ওকেও চিনি।

কাশেম আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কবে থেকে খেয়া পারাপারের কাজ করছে। সে একটা হাত তুলে দেখাল, যখন থেকে সে এইটুকু বাচ্চা ছেলে তখন থেকে। অর্থাৎ আমার জন্মের আগে থেকে। তবে এই কি সেই, যাকে আমি ছেলেবেলায় দেখেছিলাম? হতেও পারে, নাও হতে পারে। তখন স্টিমার ফেরি ছিল না—সুতরাং অনেকগুলো খেয়া নৌকো ছিল নিশ্চয়ই। তার মধ্যে একজন মাত্র সবল চেহারা মাঝির কথা আমার মনে আছে। সে আর একজন।

—কাশেম ভাই, তুমি কখনো ইণ্ডিয়ায় গেছ?

—না কত্তা। কোথাও যাই নাই। গরিব মানুষ, কোথায় আর যামু?

—গত বছর যখন খুব যুদ্ধ ছিল?

না, তখনো কাশেম আলি কোথাও যায়নি, সে শুধু খেয়া পারাপার করেছে। বস্তুত সেই সময় তার রোজগার ভালোই ছিল, কেননা—কিছুদিন স্টিমার ফেরি অচল হয়ে থাকে। সে খানসেনাদেরও পারাপার করেছে, রাতের অন্ধকারে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদেরও এপার ওপার নিয়ে গেছে—উদ্বাস্তু দলকেও নদী পার করে দিয়েছে। কেউ বেশি পয়সা দিয়েছে, কেউ পয়সা দিতে পারেনি। এসব কথা সে আমাকে অকপটে জানায়।

সে খেয়ার মাঝি, সে তো প্রতীকের মতন, আবহমান কাল ধরে পারাপার করাই তার কাজ। এর মধ্যে পাপপুণ্য নেই। কোন দিকে পাপ, কোন দিকে পুণ্য সে জানে না—সে শুধু জানে নদীর এপার আর ওপার। ওপার থেকে এপারে, এপার থেকে ওপারে মানুষ যেতে চায়। মাঝখানে নদী থাকে উদাসীন, সেও ঐ নদীর অংশ। আমি বুঝতে পারি।

কোনো বীভৎস দৃশ্য, কোনো অত্যাচার কি কাশেম আলি দেখেনি? না দেখে উপায় কি। উনিশশো একাত্তরে সে দেখেছে নদীর জলে ভেসে আসা টাটকা যুবতীর লাশ। দেখেছে দিবা দ্বিপ্রহরে মানুষ খুন।

নির্লিপ্তভাবে সে বলে যাচ্ছিল—দু একটা ঘটনা শুনেই আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। ঐ সব বীভৎস ঘটনা আমি আর বারবার শুনতে চাই না—কী আর হবে কবর খুঁড়ে ঐসব স্মৃতি জাগিয়ে। যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে।

আমি কাশেম আলিকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, এ নদীতে মাছ কী রকম বলো? সে আমাকে মাছের কথা বলল। শীতকালে এ নদীতে কতটা জল থাকে? সে আমাকে জলের কথা বলল। এখন আর সে নির্লিপ্ত নয়। এই নদীর কথাই যেন তার ব্যক্তিগত কথা। বর্ষার সময় দুকূল প্লাবী ঢলের কথা বলতে গিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি বললাম—কাশেম ভাই, অনেকদিন আগে, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান এইসব হওয়ার আগে আমি এই নদীতে অনেকবার খেয়া পার করেছি। আমি তোমাকে সেই তখন থেকে চিনি।

কাশেম তার ছানি-পড়া ঝাপসা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, হ, আপনেরেও আমার তাই চেনা চেনা লাগে।

আমরা দুজনে কেউই পুরোপুরি মিথ্যে কথা বলিনি।

৮

নাগরদোলা ঘুরছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, জোরে, আরো জোরে ঘোরাও। আরো। দধ-সাবু খেয়ে চালাচ্ছ নাকি? আরো জোরে।

বিপরীত দিকের দোলনাটা থেকে সেই মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল, এই, এই, আর না, আর না— আমার মাথা ঘুরছে! থামাও! থামাও!

সুন্দরী মেয়েকে ভয় দেখাতে কার না ইচ্ছে হয়। হোক না অচেনা! আমি লঘু গলায় ফের দোলনাওয়ালাদের উত্তেজিত করতে লাগলুম, না, না, থামবে না! আরো জোরে!

মেয়েটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, না, না, খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি! দোলনা ছিঁড়ে পড়বে। আমি বললুম, অত ভয় পেলে নাগরদোলায় উঠতে গেছেন কেন?

এই থেকে আলাপ। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার ঘুরন্ত বাতাসের মধ্যে দেখা। এক দোলনায় আমরা চারজন, অন্য দোলনায় ওরা। আমাদের দোলনায় বন্ধু, তার স্ত্রী ও শ্যালকের সঙ্গে আমি। ও দোলনায় ওরা চারজন মেয়ে। সেই

মেয়েটির গায়ের রং কুচকুচে কালো। কিন্তু অমন রূপসী মেয়ে কদাচিৎ চোখে পড়ে। সবার চোখ ঘুরে ঘুরে ঐ মেয়েটির দিকেই আসবে। কালো ঝকঝকে শরীর, তার পরনে সাদা শাড়ি, ব্লাউজ সাদা, চটি সাদা, হাতে ঘড়ির ব্যাণ্ডটাও সাদা, আর কোন অলঙ্কার নেই, গলায় শুধু একটা শ্বেত মুক্তামালা। কোনারকের সুরসুন্দরী মূর্তি যে দেখেছে, সেই শুধু মেয়েটির রূপ খানিকটা অনুমান করতে পারবে।

নাগরদোলা থামল, ওরা নেমে পড়তেই আমি বললুম, একি, হয়ে গেল? আর একবার ঘুরবেন না?

অচেনা মেয়েরা সব অনুরোধ বোঝে না। অনুরোধকে মনে করে 'আওয়াজ দেওয়া'। সেই মেয়েটি কিছু বলবার আগেই তার অন্য একটি সঙ্গিনী বার্লি খাওয়া চেহারার মেয়ে বলল, কি অসভ্য ছেলেগুলো। চল কৃষ্ণা—

নাম জানলুম কৃষ্ণা। আমার এক পিসিরও গায়ের রঙ ছিল খুব কালো—নাম ছিল পূর্ণিমা। অচেনা লোকজনের মধ্যে কেউ তাকে পূর্ণিমা বলে ডাকলে তিনি হেসে আকুল হতেন। বলতেন, অত চেঁচিয়ে ডাকিস না—লোকে পূর্ণিমা শুনে তাকিয়ে দেখবে—এল একখানা অমাবস্যা! পূর্ণিমা পিসিকে আমি ভালোবাসতুম; সেই থেকে আমি কালো রঙ অমাবস্যা ভালোবাসি!

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের রোগ নির্ণয়ের মতন শান্তিনিকেতন মেলায় সবাই কোনো-না-কোনো সূত্রে চেনা। বিকেলবেলা আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম তার অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে। সেই অধ্যাপকের আবার এক অন্য বন্ধুর ছোট বোনের চারজন বান্ধবী বেড়াতে এসেছে। ওরকম সম্পর্ক ধরলে পৃথিবীর সবাই যে সবাইকার বন্ধু-বান্ধবী, মানুষ সেটা ভুলে যায়। সুতরাং আমার বন্ধুর বন্ধুর ছোট বোনের চারজন বান্ধবীকে আমি মোটেই পর ভাবলুম না। আপন ভেবে বিনা দ্বিধায় আলাপ পরিচয় শুরু করে দিলুম। নাগরদোলার সেই চারজন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণা।

অনেক মেয়ের কালো রঙের জন্য লজ্জা থাকে।

কৃষ্ণার নেই, কৃষ্ণা অহংকারী। সে জানে, সব পুরুষই তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য। চায়ের কাপ ঠোঁট থেকে নামিয়ে কৃষ্ণা বলল, আপনি ভারী পাজী! নাগরদোলা অত জোরে চালাতে বলেছিলেন কেন?

আমি বললুম, চলুন, আমার সঙ্গে আবার চড়বেন আসুন। আমি ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি!

কৃষ্ণার সঙ্গিনী সেই বার্লি-খাওয়া মেয়েটি কড়া চোখে তাকাল। তাকে দেখলেই মনে হয়—ভবিষ্যতে সে কোনো মেয়ে-হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হবে। তা হোক, তাতে আমার কোনো ভয় নেই। আমার পেড়াপিড়ি ও

আগ্রহাতিশয্যে ফের দলবল মিলে সবাই এলুম নাগরদোলায় চাপতে। এখন তো আলাপ হয়ে গেছে, এখন আর দ্বিধা কি। নাগরদোলার প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে আমি কৃষ্ণার বাহু চেপে ভয় দেখিয়ে বললুম, এবার ফেলে দিই? দিই ফেলে? বাচ্চা বালিকার মতন কৃষ্ণা হাসতে হাসতে ভয় পেতে লাগল। আমি এমনিতে একটু বোকাসোকা লাজুক ধরনের ছেলে, কিন্তু কৃষ্ণার পাশে বসে হঠাৎ যে কি করে সেদিন অত চালু হয়ে গেলুম, কে জানে।

কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোট। কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চেনা অনেকে বেরিয়ে পড়ল—যদিও কৃষ্ণা থাকে বালিগঞ্জে—আমি থাকি চরম উত্তর কলকাতায়। আমাকে 'নর্থ ক্যালকাটার ছেলে' বলে একবার ঠাট্টাও করলে ওরা। তবু ওর চেনা কয়েকজনকে আমি চিনি—আমার চেনা কয়েকজনকেও চেনে কৃষ্ণা। ঐ যে আগেই বলেছি—বন্ধুর বন্ধুতেই পৃথিবীটা ভর্তি।

শান্তিনিকেতনে আমি একদিন বেশি থেকে গেলুম, আগের দিন চলে গেল কৃষ্ণারা। যাবার আগে কৃষ্ণা ওর বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়ে গেল, আমিও দিলুম আমারটা। স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছাড়ার আগে বেশ আন্তরিকভাবেই বলল, বাড়িতে আসবেন কিন্তু একদিন। ঠিক আসবেন।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলুম মাসাঞ্জোর, সেখান থেকে দুর্গাপুর ঘুরে কলকাতায় ফিরলুম সাতদিন বাদে। রাত্তির বেলা জি টি রোড ধরে বন্ধুর জিপে করে আসছিলুম, সেদিন চাঁদের আলো পৃথিবীটা ধুয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল কৃষ্ণার কথা।

কিন্তু কৃষ্ণাকে আমি কোনোদিন ফোন করিনি, চিঠি লিখিনি, দেখা করতেও যায়নি। কেন? ঠিক কারণটা আমি নিজেও জানি না। এই জন্যই তো গল্প লিখতে পারি না। গল্পে যা-যা মানায় তার কিছুই ঠিকমতো আমার মাথায় আসে না। শান্তিনিকেতনে অমন চমৎকার ভাবে যে রূপসী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হলো, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিয়ে যে কলকাতায় আবার দেখা করতে বলল—তার সঙ্গে দেখা করে পরিচয় আরো ঘনিষ্ট করাই তো স্বাভাবিক, গল্পেও সেই রকম হয়। কৃষ্ণার সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা এখনো আমার কাছে আছে অথচ একদিনও আর দেখা হয়নি।

আমি কেন দেখা করিনি? একজন মানুষের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ লুকিয়ে থাকে। একই মানুষ কিন্তু মায়ের সামনে, অফিসের বড়োবাবুর সামনে, বন্ধুর সামনে, স্ত্রীর সামনে এবং প্রেমিকার সামনে, ছোট ভাইয়ের সামনে—সে বিভিন্ন, বলা যায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব। সেইরকম, যে মানুষ শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায় বেড়াচ্ছে আর যে কলকাতার ভিড়ের বাসে ঝুলছে—এরা দুজনেও

আলাদা। শান্তিনিকেতনে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার সময়ে কোনো দ্বিধা ছিল না, বিনা ভূমিকায় অনায়াসেই লঘু চাপল্য এবং ইয়ারকি শুরু করতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতায় অন্যরকম। শান্তিনিকেতনের সেই একখানা বিরাট আকাশ, লাল ধুলোর রাস্তা, মেলার হট্টগোল আর সোনাঝুরি গাছে হাওয়ার ঢেউ—এই পটভূমিকার বদলে ট্রামলাইন পেরিয়ে গলিতে ঢুকে বাড়ির নম্বর খুঁজে দরজার কলিংবেল বাজিয়ে বা কড়া নেড়ে—বৈঠকখানায় বসে কৃষ্ণার বাবা বা দাদার সঙ্গে অনেক পরিচয় করে তারপর কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু অন্যরকম হতে বাধ্য। টেলিফোন করেই বা কি বলব? বলব কোথাও দেখা করতে। নিয়ে যাব কোনো রেস্টুরেন্টে? যাকে নাগরদোলায় চাপার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলুম, তাকে কি ঠিক সেই একই ভাবে রেস্টুরেন্টে আসার আমন্ত্রণ জানান যায়? আমি ভেবে পাইনি। আমি আর দেখা করিনি কৃষ্ণার সঙ্গে।

দেখা করিনি, কিন্তু ক্ষীণ আশা করেছিলুম—কৃষ্ণা নিজে হয়তো আমাকে চিঠি লিখবে বা দেখা করবে। আমি জানতুম, তা অসম্ভব। কোনো মেয়ে যেচে কোনো ছেলেকে চিঠি লেখে নাকি আগে? ছেলেটিকে তার ঠিকানা দেওয়া সত্ত্বেও! আর, কৃষ্ণা ওরকম ঝলমলে রূপসী—তার নিশ্চয়ই অনেক অনুরাগী—তার বয়েই গেছে আমার মতন হেঁজিপেঁজিকে চিঠি লিখতে।

পৌষ মেলা হয় শীতকালে, তখন প্যান্ট-কোট পরার সময়। কৃষ্ণার ঠিকানা লেখা কাগজটা রয়ে গেল আমার কোটের পকেটে। শীত ফুরোলে কোটটা কাচতে না দিয়েই আলমারিতে তুলে রাখলুম। পরের বছর শীত যখন পড়ি পড়ি করছে, গরম জামাগুলো সব নামতে শুরু করছে—কোটের পকেট থেকে অন্য অনেক কাগজপত্রের সঙ্গে বেরুল সেই ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজটা। মনে পড়ল আবার কৃষ্ণার কথা, সেই কষ্টিপাথরের মতন উজ্জ্বল মসৃণ দেহ, সেই শিশুর মতন সরল পবিত্র মুখ, মনে পড়ল সেই শ্বেতবসনা সুন্দরীকে। বুকের মধ্যে একটু টনটন করে উঠল। কৃষ্ণা খুব আন্তরিক ভাবে বলেছিল ওর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে। কেন দেখা করিনি। এখন কি করব। ধুৎ, কি পাগলামি। একবছর আগে দেখা হয়েছিল, এখন গিয়ে বলা যায়—আমি এসেছি, এতদিনে আমার সময় হলো।

কাগজটা কোটের পকেটেই রয়ে গেল। প্রত্যেক বছর প্রথম প্রথম শীতে কোটের পকেট থেকে সব কিছু বার করি—অনেক পুরোনো কাগজপত্র বাতিল হয়ে যায়, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা ফেলতে ইচ্ছে করে না। চোখ বুলিয়ে আবার রেখে দিয়ে ভাবি, থাক না। পড়ে পড়ে কৃষ্ণার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার আমার মুখস্ত হয়ে গেছে—তবু ওর নিজের হাতের লেখাটা ফেলি না। এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার—এই একটা বাড়ির ঠিকানা আমার মুখস্ত—সে

বাড়িতে আমি কখনো যাইনি, সাত বছর কেটে গেছে, আর কখনো যাবও না। কৃষ্ণার টেলিফোন নাম্বার আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। অথচ ঐ নম্বর কোনোদিন আমি ডায়াল করিনি। ভুলে গিয়ে কত অসুবিধা হয়—কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কৃষ্ণার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আমার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী। এরকম অযৌক্তিক কাণ্ড করলে কি আর গল্প হয়?

বরং আর একটি অযৌক্তিক ব্যাপার আজকাল আমার মাথায় আসে। মাঝে মাঝে মনে হলো, কৃষ্ণা তো একবার ভাবলেও পারত—ওর ঠিকানা লেখা কাগজটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—ওর ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বরটা আমার মনে নেই—সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। কিন্তু ওকি আমায় একটা চিঠিও লিখতে পারত না? কিংবা টেলিফোন? এই ভেবে কৃষ্ণার ওপর প্রবল অভিমান হয় আমার।

৯

বাচ্চা সাধুজী চেঁচিয়ে উঠলেন, অলখ নিরঞ্জন। আমার বেশ মজা লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, সাধুজী, আপনার দেশ কোথায় ছিল? আপনি কি জাত?

সাধুজী ক্রুদ্ধ চোখ পাকিয়ে আমার দিকে অগ্নি হেনে বললেন, সারে দুনিয়া হামারা দেশ, ভগবানকা সন্তান...। গলার স্বরে এমন আন্তরিকতা ও তেজ যে আমার খুব তারিফ করতে ইচ্ছে করল।

আমি বললুম, বাঃ, বেশ, বেশ। চমৎকার। খুব ভালো বলেছেন।

সাধুটির বয়েস বারো কিংবা তেরো বছর। ইয়ার্কি করে বায়ো কি ত্যায়ো—বলছি না, সত্যিই ওর বেশি বয়েস নয়। মুখে দাড়িগোঁফের রেখাও ওঠেনি। সদ্য-কৈশোরের মসৃণ চামড়া, ঝকঝকে চোখ—এই বয়সের প্রতিটি ছেলে ও মেয়েকে যে রকম সুন্দর দেখায়,—সাধুটিও সেইরকম সুন্দর, শুধু মাথার চুলে ধুলো মেখে জট পাকিয়েছে, সারা গায়ে ছাই মাখা, পরনে একটি নেংটি—এইটুকুই সাধুত্বের চিহ্ন। গঙ্গার পাড়ে, নিমতলা শ্মশানঘাটের পাশে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে। আট-দশজন ভক্তও জুটেছে চারধারে। ভক্তদের কাছে ওর নাম বাচ্চা মহারাজ।

আমরা কয়েক বন্ধু প্রায়ই শ্মশানে বেড়াতে যাই। মড়া পোড়ানো দেখতে আমাদের বেশ ভালো লাগে। তাছাড়া জায়গাটা ভালোভাবে চিনে রাখাও হচ্ছে। এখন পায়ে হেঁটে আসছি, যেদিন চারজন মানুষের কাঁধে চেপে আসব—সেদিন

যেন তাদের বলে দিতে পারি, ওহে, ডানদিকের ঐ চিতাটা নিও না, ওটাতে এমন হু-হু করে হাওয়া লাগে যে, খুব ট্রাবল দেয়, প্রায়ই নিভে যেতে চায়। তার পরের চিতাটার পাশ দিয়েও খুব লোকজনের আনাগোনা। তার চেয়ে বাঁ দিকের কোণের এই চিতাটা নাও—এটা বেশ নিরিবিলি, গোলমাল কম, এটায় বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আরামে পুড়তে পারব। এদিকটায় আঁচ এত বেশি যে সব চোখের জল নিমেষে বাষ্প হয়ে যায়।

শ্মশানের পাশে, গঙ্গার ধারে কয়েকজন সাধুর ধুনি জ্বলে। গাঁজা টানার লোভে সেদিকে গিয়েও আমরা মাঝে মাঝে বসি। যাদের বুকের মধ্যে সর্দি কিংবা সুবারি নেই, তাদের পক্ষে গাঁজা বেশ উপকারী। এই সব সাধুদেরও আমার খুব ভালো লাগে—বস্তুত সমস্ত গৃহত্যাগী মানুষ সম্পর্কেই আমার দুর্বলতা আছে।

'অলখ নিরঞ্জন'—রব শুনেই আমি বাচ্চা মহারাজের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ছেলেবেলায় 'বন্দী-বীর' কবিতায় পড়েছি, 'অলখ নিরঞ্জন, মহারব উঠে, বন্ধন টুটে, ভয় করে ভঞ্জন...'। আমার ধারণা হলো, ঐ বাচ্চা সাধুটিও 'বন্দী-বীর' কবিতা পড়েই 'অলখ নিরঞ্জন' কথাটা শিখেছে। ওকে কোনক্রমেই পাঞ্জাবি মনে হয় না, আর শিখের বাচ্চা গঙ্গার ধারে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গাঁজা খাবে কেন? ওঁদের ধর্মচর্চা তো এ রকম নয়।

বাচ্চাটার তেজ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলুম। ওকে ঘিরে যে আট-দশজন ভক্ত বসে আছে—তারা সবাই মধ্যবয়স্ক এবং প্রৌঢ়। তাদের সকলেরই গাঁজা টানাই অন্যতম মতলব হলেও, তারা কেউ নাস্তিক নয়, তারা ঐটুকু বাচ্চা সাধুকেও 'আপনি' সম্বোধন করছিল, তার হুকুম মতন ধুনি সজীব রাখছে, জল আনছে গঙ্গা থেকে, কাঠ জোগাড় করেছে। বাচ্চা মহারাজ অবলীলাক্রমে হুকুম করছে ওদের, ধমকাচ্ছেও মাঝে মাঝে। আমি ধর্মদ্রোহী নই, অধিকাংশ শহুরে মানুষের মতন আমি ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন এবং ধর্মপ্রবণ মানুষদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার কখনো জাগে না। বাচ্চা সাধুটিকে নিয়ে মজা করার লোভও আমার হয়নি। বরং আমি বিস্মিতভাবে ওকে লক্ষ্য করছিলুম। অলৌকিক বা দৈব কোনো শক্তি থাকুক না থাকুক—ঐ বাচ্চাটি যে অনেক বিষয়ে অসাধারণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বয়সে এমন ব্যক্তিত্ব সে অর্জন করল কোথা থেকে? প্রতিটি কথার অমন চমকপ্রদ উত্তর দেওয়া সে শিখল কি করে?

আমার এক ভাগ্নে আছে, তারও বয়েস ঐরকম, তেরো-চোদ্দ হবে। ইংরাজি ইস্কুলে পড়ে, ফরফর করে ইংরেজি বলে—কথায় কথায় আমার উচ্চারণে ভুল ধরে দেয়। ইতিহাস ভূগোলে তার প্রখর জ্ঞান, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কোথায়—এক

নিমেষে সে ম্যাপে দেখিয়ে দিতে পারে—কিন্তু তাকে যদি চৌরঙ্গিতে একা ছেড়ে দেওয়া হয়, সে কিছুতেই রাস্তা চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। একা ঘরে শুতে দিলে তার ভূতের ভয় করে। আর এই বাচ্চা মহারাজ, রাতের পর রাত খোলা আকাশের নীচে কাটাচ্ছে—দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করলে আন্তরিক বিশ্বাসে বলে সারা দুনিয়া আমার দেশ। গায়ে ছাই মেখে, মাথায় জটা রাখলেই কি এসব শেখা যায়?

আমি বাচ্চা সাধুর একেবারে গা ঘেঁসে বসলুম। বাঙালি ছেলে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই—যদিও খুব হিন্দী বলার চেষ্টা করছে—বোধ হয় ওর ধারণা হয়েছে, সাধু হলেই হিন্দী বলতে হয়। মাঝে মাঝে বাংলা বলে ফেলছে, তাতে স্পষ্ট বীরভূম জেলার টান। 'অলখ নিরঞ্জন' কথাটা খুব ভালো লেগেছে বলেই হয়তো মাঝে মাঝে ওইটা বলে চেঁচিয়ে উঠছে, দু-একবার 'বোম মহাদেব' জুড়ে দিচ্ছে।

লাল ন্যাকড়া কলকেতে জড়িয়ে বাচ্চা মহারাজ বেশ জুৎ করে ধরল। চোখ বুজে বিড়বিড় করে কি যেন বলে আগুনে কিছুটা গঙ্গা জলের ছিটে দিল। তারপর পুনরায় অলখ নিরঞ্জন, বোম বোম মহাদেব উচ্চারণ করে গাঁজার কলকে ঠোঁটে ছোঁয়ালো—বাপস, সে কি টান। আমার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। টানের চোটে গাল তুবড়ে গেল, কলকের মাথায় দপ দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। টান শেষ হলে আমার দিকে কলকেটা এগিয়ে ধরা গলায় বলল. লে বাচ্চা। ভক্তিভরে কলকেটা নিয়ে আমিও যথাসাধ্য টান দিয়ে আমার পাশের গুরুভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে বললুম, লে ভাইয়া।

গাঁজার টানে আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি বাচ্চা মহারাজকে বললুম, সাধুজী, আপনাকে আমি বীরভূম জেলায় দেখেছি!

চমকে উঠে ও আমার দিকে তাকালে। তারপর ফের উদাসীন গলায় বলল, হো সক্তা। গিয়া উধার!

—আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন?

—কাশী।

—তার আগে কোথায় ছিলেন?

—কেদার-বদ্রি।

—কেদার-বদ্রি? সত্যি? কতদিন ছিলেন?

বাংলা সাহিত্যে কেদার-বদ্রি ভ্রমণকাহিনীর অভাব নেই। সেইসব ভ্রমণকাহিনী পড়া বিদ্যে থেকে আমি সাধুটির বিবরণ শুনে বুঝতে পারলুম, সে সত্যি কথাই বলছে। ফের জিজ্ঞেস করলুম কবে থেকে সাধু হলেন? বীরভূমে আপনার বাড়ি ছিল নিশ্চয়ই—বুঝতে পারছি। আমি বীরভূমে প্রায়ই যাই, ছ'সাত বছর আগে

বাচ্চা অবস্থায় আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

—নেহি!

—কাঁহে দোঁখা দেতা হায় মহারাজ? ইস্কুলে পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে ভেগেছিলেন?

—নেহি! ঝুটাবাত।

—তবে, মা বুঝি খুব মেরেছিল একদিন? কিংবা কোনো কিছু চুরি করেছিলেন? ধরা পড়ে গিয়ে, ভয়ে পালিয়ে ছিলেন?

—বিলকুল ঝুট, মিথ্যে কথা।

তেজস্বী বাচ্চা মহারাজের মুখ এক মুহূর্তের জন্য একটু মলিন হয়ে গেল! চোখের দৃষ্টি দূরে চলে গেল। অভিমানী গলায় বলল, আমার মায়ের তো পান বসন্ত হলে—আস্তে আস্তে পুরো গল্পটা শুনলাম। স্মল পকসে ওর বাবা, মা, দুই বোন—এক মাসের মধ্যে মারা যায়। ওর আর আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। ন'বছর বয়সে ওর গ্রামের এক সম্পন্ন ব্যক্তি ওকে বাড়ির চাকর রেখেছিল। দু'এক মাস কাজ করেছেও সেখানে—বিষম খাটাত তারা, খেতে দিত না পেট ভরে। গ্রামের শ্মশানে এক সাধুর আস্তানা ছিল—সেই সাধুই ওকে পছন্দ করে চেলা বানিয়ে নিলেন তখন। তারপর চারবছর ধরে সাধুটির সঙ্গে বহু জায়গায় ঘুরেছে, এখন সেই সাধুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে নিজেই স্বাধীন সাধু হয়েছে! এখান থেকে যাবে গঙ্গাসাগরের মেলায়।

ছেলেটিকে আমার বেশ ভালো লাগল। বাপ-মা অনাথ, হয়তো সারাজীবন কারুর বাড়ির চাকর হয়েই থাকতে হতো। কিংবা চোর-জোচ্চোর হওয়াও অসম্ভব ছিল না। তার বদলে এই তো বেশ স্বাধীন জীবন পেয়েছে। কোনোদিন ঈশ্বরকে পাক বা না পাক—স্বাধীনতা তো পেয়েছে। বাড়ির সমস্যা নেই, পোশাকেব সমস্যা নেই, শুধু দুটি খাওয়া—তা ভারতবর্ষে সাধুদের এখনো খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়নি। আরো কয়েকটা কথা বলে বুঝতে পারলুম, ছেলেটার মধ্যে ঘরে ফেরার ইচ্ছে একেবারেই মরে গেছে, সুতরাং বিশেষ কোনো লোভ নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। এই খোলা আকাশ আর ভ্রমণের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। ক্ষতি তো কিছু হয়নি, এই রকম অবস্থায় থেকেও কি চমৎকার ঝকঝকে স্বাস্থ্য।

গাঁজা খাওয়ার পর বেশি করে দুধ খেতে হয় নাকি। ছেলেটির প্রতি মায়াবশত আমি বললুম, বাচ্চা মহারাজ, আপনি একটু দুধ খাবেন? সে অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বলল, নেহি। আমি বললুম, আপনাকে আমার কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে, মাখন রুটি খাবেন?

যেন খুব খারাপ জিনিসের নাম করছি—এইভাবে আবার বলল, নেহি। উসব

নেহি খাতা হায়! আমি ফের বললুম তবে কিছু ছাতু খাবেন? তাতেও তার আপত্তি। কচুরি? না। এবার আমার একটু রাগ হলো। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, এই খোকা বেশি চালাকি হচ্ছে, না? একটা কিছু খাওয়াবো বলছি, গ্রাহ্যই হচ্ছে না? ঢং? এক গাঁট্টা মেরে সাধুগিরি ঘুচিয়ে দেব।

আমার ধমকে কিন্তু বাচ্চা সাধু রেগে উঠল না। একদৃষ্টে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে লাজুক গলায় বলল জিলিপি খিলায় গা? আভি গরম ভাজতা হায়। একঠো টাকা দেও। একঠো টাকা—

আমি হাসতে হাসতে ওকে একটা টাকা দিতেই ও সাধুর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিরিং করে লাফিয়ে আগুন ডিঙিয়ে কোথায় ছুটে গেল। ফিরে এল একটু বাদেই—হাতে এক ঠোঙা জিলিপি নিয়ে। আমাদের সবাইকে একটু একটু টুকরো ভেঙে দিল। তারপর ঠোঙা হাতে পিছন ফিরে বসে জিলিপি খেতে লাগল। আগে রসটা টেনে নিয়ে তারপর একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। কি খুশি।

১০

মা জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁরে, কাল শান্তাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

আমি বই হাতে অন্যমনস্ক, তবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই বুঝলাম মা আসছেন আমার ঘরে এবং এসে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করবেন। মা তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি বলল শান্তা?

বইয়ের যে একেবারে শেষ লাইনে এসে চোখ থমকে আছে, সুতরাং সেই লাইনটা না পড়ে উত্তর দেওয়া যায় না। শেষ করে, বইটা মুড়ে রেখে চোখ তুলে উত্তর দিলাম, শান্তামাসির সঙ্গে দেখাই হলো না। বড়ো মেসো শান্তামাসি টালিগঞ্জ গেছেন শুনলুম, বাড়িতে আর কেউ নেই, ছোটকু বাথরুমে ছিল, আর নবনীতাকে দেখলুম তার প্রাইভেট টিউটর পড়াচ্ছে—তখন ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না। তাই আমি বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে চলে এলাম। আমার একটা কাজ ছিল।

—শান্তার শাশুড়ি ছিল না?

—দেখলাম না তো!

—আজ তাহলে একবার যাস।

ততক্ষণ আমি আবার বইটা খুলেছি, পরের পাতার প্রথম লাইনে চোখ নিবদ্ধ, উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, দেখি যদি পারি তো একবার যাব আজ আবার—

—শান্তার টেলিফোনটা খারাপ, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, তুই

একটু জিজ্ঞেস করে আসিস আজ, ওর কি মত, সেই বুঝে—

—যাব যাব, বলছি তো সময় পেলে আজ যাব—

আজ যে যাব তা বহুক্ষণ আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি সিঁড়িতে মার পায়ের শব্দ পেয়েই—যত কাজই থাক আজ যাব। কেননা কাল আমি সত্যিই যাইনি। ওটা মিথ্যা কথা। শান্তামাসির মেয়ে নবনীতার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ির দেবনাথের বিয়ের সম্বন্ধ মা প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। দেবনাথের বাবার চিনির কল আছে, দেবনাথ নিজেও জার্মানি থেকে ও ব্যাপারে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা তার। খুবই সুপাত্র যাকে বলে। এ বিয়ে হলে শান্তামাসিও আনন্দে আটখানা হবে, আমারও কারণ আছে, স্যাকারিন দিয়ে চা খেয়ে খেয়ে জিভ তেতো হয়ে গেল, এ বিয়ে হলে নবনীতার শ্বশুরবাড়ি গেলে নিশ্চয়ই চিনি দেওয়া চা খাওয়া যাবে সব সময়। ও বাড়িতে নিশ্চয়ই প্রত্যেকদিন চায়েতেই চিনি থাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা সব কাজ ফেলে শান্তামাসির বাড়িতে গেলুম। শান্তামাসি বাড়ি ছিলেন, শান্তামাসি এই সম্বন্ধের কথা শুনে খুব খুশি—নবনীতাকে আমি বিয়ের কথা বলে রাগালুম। আমার আগের দিন না আসায় কোনো ক্ষতি হয়নি, মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথা বলাটা ধরা পড়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। মা মাসিতে এমন কথা হবে যে আগের দিন আমি গিয়েছিলুম কি যাইনি—সে প্রসঙ্গই উঠবে না। কিন্তু আমার মিথ্যে কথায় একটু খুঁত রয়ে গেল।

শান্তামাসির বাড়িতে এর আগে গিয়েছিলুম মাস দুয়েক আগে, সেদিন ঘরভর্তি সবাই বসে গল্প করছিল। এমন সময় ঝি এসে নবনীতাকে বলল, দিদিমণি—তোমার মাস্টারমশাই এসেছেন। আড্ডার মাঝপথে নবনীতাকে উঠে যেতে হলো, শুনলাম পরীক্ষার আগের চারমাস ওকে ওদের কলেজের একজন অধ্যাপক বাড়িতে পড়াচ্ছেন—নবনীতা বরাবরই ইংরেজিতে একটু কাঁচা। সেদিন উঁকি মেরে দেখেছিলাম, আমারই বয়েসী অ্যাংরি ইয়ংম্যান টাইপের এক ছোকরা ওর সেই অধ্যাপক।

সুতরাং, মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলবার সময় পরিবেশ ফোটাতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয়নি। শান্তামাসির ভাসুরের ক্যান্সার হয়েছে, তাঁকে দেখতে প্রায়ই ওরা টালিগঞ্জে যান। সুতরাং শান্তামাসির টালিগঞ্জে যাওয়ার কথা শুনলে মা অবিশ্বাস করবেন না। ছোটকুর স্বভাব অফিস থেকে ফিরেই ঘণ্টাখানেক বাথরুমে কাটানো—দিনে তিন-চারবার চান করা ওর বাতিক। আর সন্ধ্যাবেলা নবনীতার অধ্যাপক তো পড়াতে রোজই আসে। শান্তামাসির শাশুড়িও প্রায় রোজ বিকেলেই মহানির্বাণ মঠে কথকতা শুনতে যান। সুতরাং বইয়ের দিকে মনোযোগ দেবার

অছিলায় আমি চট করে মিথ্যে কথাটা বানিয়েছিলাম। তবু একটা খুঁত রয়ে গেল। পরের দিন শান্তামাসির বাড়িতে গিয়ে কথায় কথায় জানতে পারা গেল, দিন পনের আগে নবনীতার সেই অধ্যাপককে নাকি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীন অধ্যাপকটি উগ্র আধুনিক এবং উদ্ধত, বাড়ির সবার সামনে সিগারেট খায়, এমনকি দেশলাই চেয়েছে—এই অপরাধে তার চাকরি গেছে। শান্তামাসি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বুড়োসুড়ো ধীর-স্থির আর কোনো অধ্যাপককে জোগাড় করে দিতে পারি কিনা।

মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথাটায় খুঁত থেকে গেল—নবনীতা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ছে। তা যাকগে, আসল কাজটা তো ঠিকঠাকই হচ্ছে—সামান্য একটা মিথ্যে কথায় কি আসে যায়।

কিন্তু মায়েব কাছে ঐ মিথ্যে কথাটা আমি কেন বললুম? যদি বলতুম, না মা, কাল শান্তামাসিদের বাড়িতে যেতে পাবিনি, আজ যাব—তাহলে কি এমন ক্ষতি হতো? মা দু'তিন দিন ধরেই যেতে বলেছিলেন, আমি রোজই যাব যাব করে পাশ কাটাচ্ছিলুম, সুতরাং তিনদিনের দিন ঐ মিথ্যে কথা এবং চতুর্থ দিনের দিন সত্যিই যাওয়া। কিন্তু তৃতীয় দিনেও ঐ মিথ্যেটা না বলাই তো আমার উচিত ছিল। তবে কেন?

—তারপর ইন্দ্রনাথ স্টেশনেব প্লাটফর্মে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—তাই নাকি? তাবপব?

—প্লাটফর্মেব বিশেস লোকজন নেই, কয়েকটা ছোকরা একদিকে জটলা করছিল— তাদের চেহাবাও বিশেষ সুবিধের নয়—ইন্দ্রনাথেব ঐ অতবড জোয়ান শবীর আমাব পক্ষে বয়ে নিযে যাওয়াও সম্ভব নয়। মাথায জল ছেটানো দরকার —অথচ ওকে ফেলে রেখে যেতে পাবছি না।

—কেন, তাতে কি হবে?

—ইন্দ্রনাথের পকেটে চাব হাজাব টাকা ছিল, ও আমাকে আগেই বলেছিল —সুতরাং ওকে একা ফেলে যাওয়া, আব সেই ছোকবাগুলোব রকমসকম.

—তখন কি করলি?

—ইন্দ্রনাথেব ওপর চোখ বেখে একটু দূরে ঘোবাঘুরি কবে অতিকষ্টে একটা কুলিকে দেখতে পেলুম, ছোট স্টেশন তো .. কুলিটাকে দিযে জল আনালুম এক বালতি... তারপর পৌনে দু'ঘণ্টা বসে থাকার পব পবের ট্রেন যখন এল।

ইন্দ্রনাথ এবং আমার—দু'জনের বন্ধু এমন একজনকে ঘটনাটা শোনাচ্ছিলাম। ঘটনাটি সবই সত্যি। ইন্দ্রনাথেব একদিন সত্যিই খুব শরীর খারাপ হয়েছিল এবং অজ্ঞান হযে গিয়েছিল রাত্রিবেলায় প্লাটফর্মে। কিন্তু বলবার সময় কেন যে একটু বদলে গেল—কিছুই বুঝি না। ইন্দ্রনাথ বলেছিল ওর পকেটে দেড় হাজার টাকা

আছে। দেড় হাজার টাকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবু সেটাকে বাড়িয়ে চার হাজার টাকা বলার ইচ্ছে আমার কেন হলো; আমি নিজেই জানি না। পরের ট্রেন এসেছিল আধঘণ্টা বাদে—আমি সেটাকে বাড়িয়ে করলুম পৌনে দু'ঘণ্টা। কেন? এমনকি আধঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টাও নয়, পৌনে দু'ঘণ্টা। ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেবার জন্য এই মিথ্যের অবতারণা? পকেটে দেড় হাজার টাকা নিয়ে নির্জন প্লাটফর্মে এক বন্ধুর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই তো স্পষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—তাকে আরো বাড়িয়ে লাভ কি? তাহলে কি সব সময় যা ঘটে—তারই পুনরুক্তি করতে একঘেয়ে লাগে বলেই এইসব নির্দোষ মিথ্যে বলতে সাধ হয়?

—রতনটা একেবারে বাজে ছেলে। কোনো কথা দিয়ে কথা রাখে না—বড়ো বৌদি বললেন।

—অফিসেও কেউ ওকে গ্রাহ্য করে না শুনেছি। মুখেই শুধু লম্বাচওড়া কথা, কাজের বেলা কিছু না—এবার ছোট বৌদি।

পারিবারিক মহলে আমার মামাতো ভাই রতনের খুব নিন্দে হচ্ছিল। আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। রতনকে আমার খুব ভালো লাগে, চমৎকার দিলখোলা মানুষ, সরলভাবে হা-হা করে হাসে, কি চমৎকার গান গায়। রতনের দায়িত্বজ্ঞান একটু কম, সময়ের ঠিক রাখে না, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না—কিন্তু একই মানুষ ভালো গান গাইবে, আবার সময়েরও ঠিক রাখার আদর্শ দায়িত্ব পালন হবে—এতটা আশা করা যায় না। রতনের আমি ভক্ত। সুতরাং আমি প্রাণপণে বৌদিদের নিন্দের প্রতিবাদ করতে লাগলুম। কিন্তু বৌদিরা ওসব গান-টানের দিকেই যাচ্ছেন না। শুধু ঐ দায়িত্বজ্ঞানটার ওপরই সব জোর। তখন আমি বললাম, রতনের দায়িত্বজ্ঞান নেই কে বলল? গত বছর সেই যে আমরা পুরী গেলুম—রতনই তো আমাদের বাড়ি ঠিক করে দিল।

বড়ো বৌদি বললেন, রতন বাড়ি ঠিক করে দিয়েছে? আমি বিশ্বাস করি না। আমি বললুম, সত্যিই! রতনের কথাতেই তো আমরা দীঘা না গিয়ে পুরী গেলুম। রতন বাড়ি ঠিক করে দেবে বলেছিল—আমিও প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করিনি—কিন্তু রতন ওর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে রেখেছিল—স্বর্গদ্বারে চমৎকার বাড়ি—ভাড়া লাগাল না—এমনকি পৌঁছে দেখলাম আমাদের জন্য খাবারদাবার বেডি। রতনদের অফিসের ম্যানেজারের বাড়ি—

—সত্যি বলছ?

রতনের নিন্দে থামাবার জন্য রতনের দায়িত্বজ্ঞানের এই কাহিনীটা বলার প্রেরণা আমার ভেতর থেকেই কে যেন আমায় দিয়ে দিল। ঘটনার কাঠামোটা তো সত্যিই। আমরা ঠিকই পুরী গিয়েছিলাম, রতন ছিল আমাদের সঙ্গে—ঠিক

করেছিলাম কোনো হোটেলে থাকব। কিন্তু স্টেশনেই রতনের অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো—তিনি কলকাতায় ফিরছেন সপরিবারে। তিনিই উৎসাহিত হয়ে বললেন, স্বর্গদ্বারে একটা বাড়ি তিনি অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দু'মাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে একমাসের পরই তিনি ফিরে যাচ্ছেন—সুতরাং সেই বাড়িতে আমরা অনায়াসে একমাস থাকতে পারি। বাকি অংশটা রং চড়ানো হলেও রতনের জন্যই তো আমরা বাড়িটা পেয়েছিলাম।

ছোট বৌদি বললেন, সত্যি, রতন পুরীতে বাড়ি যোগাড় করে দিতে পারে নাকি—আমার দাদা-বৌদি পুরী যাবেন বলেছিলেন—তা হলে রতনকে বলতে হবে তো!

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সর্বনাশ, এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি। আজ বিকেলেই রতনের কাছে ছুটতে হবে। রতনের প্রশংসা করতে গিয়ে আমিই তার বিপদের কারণ ঘটালাম।

এইসব অকারণ মিথ্যে অকারণেই অনেক সময় ধরা পড়ে যায়।

প্রথম ঘটনায় আবার ফিরে আসি। শান্তামাসির বাড়ির টেলিফোন আবার ঠিক হয়ে গেল, আমার আর দায়িত্ব রইল না কিছুই। নবনীতার বিয়ে আমার মায়ের উদ্যোগেই প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময় একদিন মা ট্যাক্সিতে আসতে আসতে দেখলেন কলেজের রাস্তায় নবনীতা আরো দুটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলের সঙ্গে খুব হাসি-গল্প করছে। এতে মনে করার কিছু নেই—আজকালকার কলেজের মেয়েরা বাইরে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে, গল্প করবে—এ তো স্বাভাবিক। মা বাড়ি ফিরেই হাসতে হাসতে বললেন, নবীনকে রাস্তায় দেখলাম, খুব বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে আমি আর ডাকিনি! তারপর মা শান্তিমাসিকে ফোন করলেন—এ কথা সে কথা সাত কাহনের পর মা জিজ্ঞেস করলেন নবনীতা বাড়ি ফিরেছে কিনা। ফিরেছে শুনে মা টেলিফোনেই ফিসফিসিয়ে বললেন, দেখ শান্তা নবীনকে যখন মাস্টার এসে পড়ায়—তখন তোরা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাস্ না! আজকালকার ছেলেমেয়ে—যতই ভালো হোক...নবীন অবশ্য সোনার টুকরো মেয়ে—কিন্তু বলা তো যায় না—কখন কি বিপদ হয়ে যায়—খবরের কাগজে যা এক একখানা খবর মাঝে মাঝে বেরোয়।

শান্তামাসি অবাক হয়ে বললেন, নবীনকে তো এখন আর কেউ পড়ায় না।

—কেন, এই যে নীলু দেখে এল গত সোমবার?

—গত সোমবার? অসম্ভব!

—হ্যাঁ, নীলু নিজের চোখে দেখে এসেছে—সেই মাস্টার নবীনকে পড়াচ্ছে, তোরা তখন টালিগঞ্জে গিয়েছিলি—

তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আবার সেই দৃশ্য, আমি আমার ঘর, হাতে বই, আমার সামনে রাশিয়া আমেরিকার মতন দুই বিশাল শক্তি, মা আর মাসিমা। শান্তামাসি : নীল তুই নিজের চোখে দেখেছিলি? মা : তুই না দেখে থাকলে শুধু শুধু কেন মিথ্যে কথা বললি? আমি আর কি উত্তর দেব? কোনো যুক্তি নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই—আমি যে এমনিই বলেছিলাম—সে কথা তো ওদের বলা যায় না! সুতরাং বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে হাসতে হাসতে বললুম, কি যে হয়েছ তোমরা, একটু ইয়ার্কিও বোঝ না?

১১

কিরে তুই এত বড়ো হয়ে গেছিস?

স্থলপদ্মের পাপড়ির মতন মুখের রং করে স্বপ্না বলল, বাঃ বড়ো হবো না? সময় বুঝি থেমে থাকবে?

শুধু চেহারাতেই বড়ো হয়নি স্বপ্না, শুধু যে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখছি তাই নয়, মনের দিক থেকেও অনেক পরিণত হয়েছে। নইলে, 'সময় বুঝি থেমে থাকবে'—এ রকম কথাও ওর মুখে অপ্রত্যাশিত। শেষবার যখন ওকে দেখেছিলাম চাইবাসায়, বছর আষ্টেক আগে, তখন ওর মাথায় ঝোলানো লম্বা বেণী, বাঘের গায়ের মতন হলদে-কালো ডোরা কাটা ফ্রক, সব সময় চঞ্চল ছটফটে, কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবার আগে একটুও চিন্তা করতে চাইত না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, কি জানি, জানি না! তখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করত স্বপ্না তুই এত ছুটোছুটি করিস কেন রে? একটু আস্তে আস্তে হাঁটতে পারিস না? সে কথাতেও স্বপ্নার উত্তর—কি জানি, জানি না।

সেই স্বপ্না এম. এ. পড়তে এসেছে কলকাতায়, এই বয়সের মেয়েরা কত উপন্যাসের নায়িকা হয়—স্বপ্নাও নায়িকা হবার যোগ্য হয়ে উঠেছে, যুবতীসুলভ মধুর-মন্থর হাঁটার ভঙ্গি, ঠাট্টা করলে মুখের রং গোলাপি হয়ে আসে, কথা বলতে বলতে চোখ দুটি বেশি উজ্জ্বল আর নিষ্পলক করে রাখে।

সময় বুঝি থেমে থাকবে?

ঠিকই বলেছে স্বপ্না, সময় থেমে থাকে না—এই আট বছরে আমিও তো কত বদলেছি—আগে ট্রামে বাসে টাকা ভাঙিয়ে খুচরো গুণতুম না, আজকাল একপলকে দেখে নিই অচল বা কম দিয়েছে কিনা, আগে কোথাও নেমন্তন্ন থাকলে সেদিন ইচ্ছে করে দাড়ি না কামিয়ে যেতুম—আজকাল প্রত্যেক দিন সকালে দাড়ি

কামাই বিনা কারণে, এখন কারুকে জিভ-ভেংচি কাটার কথা ভাবতেই পারি না। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো বন্ধুকে দেখলেও নেমে পড়ি না—অফিসে লেট হয়ে যাচ্ছে ভেবে। সত্যি, সময় থেমে থাকে না, সবাই বদলায়, আমিও বদলেছি, স্বপ্নাও তো বদলাবেই। কিন্তু আটবছর আগে দেখা আর পরের দেখায় খুব সহজে মেলানো যায় না। এই যুবতীকে আমার খুবই অচেনা লাগল, আমার চোখে সেই তেরো বছর বয়সের ছটফটে মেয়েটিই ভাসছে। মেয়েদের বোধহয় এরকম অসুবিধ হয় না। ওরা সহজে মানিয়ে নিতে পারে। আট বছরে আমার চেহারাও নিশ্চয়ই অনেক বদলেছে—স্বপ্না সেসব উল্লেখও করল না। কলেজ স্ট্রিটে ইউনিভার্সিটির সামনে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এক দঙ্গল মেয়ের ভিড় থেকে একজন আমার সামনে এগিয়ে এসে বলেছিল, এই নীলুদা—এখানে কি করছ?

প্রথমটায় তো আমি চিনতেই পারিনি। চাইবাসার সাদামাঠা কিশোরী কলকাতার সব স্টাইল কি করে এত তাড়াতাড়ি শিখে নিল? শাড়ি-ব্লাউজ-জুতো সবই নিখুঁত ম্যাচ করা, ঠোঁটের হাসিটুকু পর্যন্ত।

জিজ্ঞেস করলুম, কবে এলি? কোথায় থাকিস? মেজমামা এখন কোথায় পোস্টেড? চাইবাসা ছাড়ল কবে?

স্বপ্না এখানে মেয়েদের হোস্টেলে থাকে, ওর বাবা বদলি হয়ে গেছেন বিন্ধ্যাচলে। চাইবাসার মেয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই হোস্টেলের রাস্তা চিনিস্ তো? ঠিক যেতে পারবি, না আমি পৌঁছে দেব?

স্বপ্না হেসে বলল, কি যে বলো! এক মাস হলো এসেছি, রাস্তা চিনতে পারব না?

আমারই ভুল, যে মেয়ে কলকাতার পোশাক ও হাসির ফ্যাশান এত সহজে জেনে নিয়েছে, সে আর ট্রাম-বাসেব রাস্তা চিনতে পারবে না? অবাস্তব। কিন্তু আমার মনে পড়েছিল বোধহয়, সম্বলপুরে বেড়াতে গিয়ে পাহাড় থেকে ফিরছি আমরা বিকেলবেলা, পথে সন্ধে হয়ে এসেছিল, আমরা ছিলুম চার-পাঁচজন —সর্টকার্ট করার জন্য আমরা একটা জঙ্গলের রাস্তা ধরেছিলুম। সেই অন্ধকার জঙ্গল—অমন ছটফটে মেয়ে স্বপ্না সেও আমার হাত চেপে ধরে ভীতু-ভীতু গলায় বলেছিল, নীলুদা, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো? পৌঁছতে পারব তো?

আমি সেই কথা ভাবছিলুম। কিন্তু, একথা মনে পড়েনি, একটা বয়েস আসে —যখন মেয়েরা ইচ্ছে করেই একা অন্ধকার অরণ্যে প্রবেশ করতে চায়। ঠিক জায়গায় পৌঁছুবার বদলে পথ হারানোতেই তখন বেশি আনন্দ।

যেদিকে ওর হোস্টেল, তার উল্টোদিকে যাবার জন্য স্বপ্না তার সঙ্গিনীদের

উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। আমি বললুম, কলকাতায় তো আগে কখনো একলা থাকিস নি, সাবধানে থাকিস কিন্তু।

এটাও আমারই ভুল—সেই আট বছর আগে, নদীর ধারে গেলে যেমন কিশোরী স্বপ্নাকে বলতাম, এই তুই সাঁতার জানিস না—দেখিস, বেশি জলের ধারে যাসনি একা। স্বপ্না সাঁতার জানত না—তাই তাকে আমি জলের ধারে যেতে বারণ করেছিলুম। কিন্তু তা বলে কোনো যুবতীকে কি আর 'ডোন্ট গো নীয়ার দা ওয়াটার' বলা যায়! যুবতীরা তো জলের ধারে যাবেই—না গেলে তাদের মানায় না। আর এই কলকাতার সমুদ্রে সাঁতার না জেনেই ঝাঁপ দেওয়া যায়।

আমার কথা শুনে স্বপ্না ফিরে তাকাল। আমি যে ওর সাক্ষাৎ মাসতুতো দাদা —স্বপ্না তা গ্রাহ্যই করল না, অপর যুবকদের দিকে মেয়েরা যেরকম ভাব নিয়ে তাকায়, আমার দিকেও সেইরকম ভাবে তাকিয়ে বলল, ইস, খুব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে!

মাঝে মাঝে ছোটমাসির বাড়িতে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয়। সব সময় ব্যস্ত, বেশিক্ষণ সেখানেও থাকতে চায় না। ছোট মাসি ওকে বলেছিলেন, হোস্টেল ছেড়ে তাঁর বাড়িতে এসে থাকতে। স্বপ্না কিছুতেই রাজি নয়। হস্টেলে কত আনন্দ, কত বন্ধু—সেসব ছেড়ে এই ধাবধাড়াগোবিন্দপুর টালিগঞ্জে এসে থাকতে ওর বয়ে গেছে! আমি যখন চাইবাসায় স্বপ্নাদের বাড়িতে গিয়ে মাস দুয়েক ছিলাম—স্বপ্না সব সময় আমার সঙ্গে থাকত, কত গল্প। আমার প্রতিটি জিনিস আর কথাবার্তায় ওর ছিল পরম শ্রদ্ধা আর মনোযোগ। এখন কত দূরত্ব, এখন ওর কত রহস্য, আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না!

ছোট মাসির বাড়িতে স্বপ্না একদিন বলল, নীলুদা তুমি বড্ড কিপ্টে হয়ে গেছ আজকাল। একদিনও খাওয়ালে না, সিনেমা দেখালে না। এই তো 'ডক্টর জিভাগো' বইটা দেখাও না আমাকে।

আমি বললুম, তোরই তো পাত্তা পাওয়া যায় না। তোর কত নতুন নতুন বন্ধু এখন। আচ্ছা চল, এই শনিবার দুপুরের শো-তে, আমি টিকিট কেটে রাখব।

শনিবার বেলা দেড়টা আন্দাজ স্বপ্না আমার অফিসে টেলিফোন করে বলল, নীলুদা—তুমি টিকিট কেটে ফেলেছ? কিন্তু আমি যে আজ যেতে পারছি না! আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন রে? যাবি না কেন?

—ভীষণ মাথা ধরেছে, চোখ টনটন্ করছে। আজ আর সিনেমা দেখতে ভালো লাগবে না। আমি বললুম, ঠিক আছে, তুই আয় তো। মাথায় দুটো গাট্টা মারলেই মাথা ধরা সেরে যাবে। ঐটুকু মেয়ের আবার মাথা ধরা কি রে?

—না, সত্যি, আজ আর যাওয়া হবে না!

আমি তখন আর কি করি, একা তো সিনেমা দেখা যায় না, টিকিট দুটো অফিসের একজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে উপহার দিয়ে দিলুম।

সেদিনই সন্ধেবেলা পার্ক স্ট্রিটে দেখি স্বপ্না, পাশে একটি স্টাইলিস্ট ছোকরা —যথারীতি তার সরু প্যান্ট ও ক্রিম মাখা ঝকঝকে চুল। আমাকে দেখে স্বপ্না একটুও অপ্রতিভ হলো না, মাথা ধরার কথা তুলল না, ছোকরাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল এই যে, ইনি—আমার বন্ধু করবী, তার দাদা।

ইচ্ছে হলো স্বপ্নাকে এক ধমক দিই। কেন মাথা ধরার মিথ্যে কথা বলেছিল আমাকে? মনে আছে, আট বছর আগে, কি একটা মিথ্যে কথা বলেছিল বলে স্বপ্নাকে আমি খুব ধমকেছিলুম। স্বপ্না কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল, আর কখনো আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবে না। সেই কথা মনে পড়ায় আজ ওকে ধমকাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলিয়ে নিলুম। মনে পড়ল, সময় তো আর থেমে থাকেনি। এখন স্বপ্নার পক্ষে নিজের দাদার চেয়েও বন্ধুর দাদার প্রতি টান থাকাই তো স্বাভাবিক। আর, এসব ব্যাপারে একটু-আধটু মিথ্যে না বললে চলবে কেন?

১২

রত্নাদি বললেন, না ভাই, তার কোনো মানে হয় না। তোমার ছেলেরা সব একদিকে বসে আড্ডা দেবে, আর আমরা মেয়েরা শুধু খেটে মরব? তাহলে আর পিকনিকের মজা কি!

প্রশান্তদা কাচুমাচু মুখে উত্তর দিলেন, রত্না, আমি একটা আরজি পেশ করব? আজ একটু মেয়েদের হাতের রান্না খেতে চাই। আজকাল তো ঠাকুরের রান্না খেয়েই দিন কাটে, বছরের অন্তত একটা দিন মেয়েদের হাতের রান্না খেতে পাব—পিকনিকে সেটাই তো আনন্দ। তোমরা তো ছেলেদের সঙ্গে রোজই আড্ডা দিচ্ছ—

রত্নাদির পাশেই পড়েছিল কুটনো কোটার বঁটি—সেটা তুলে প্রশান্তদার দিকে ধেয়ে যেতে যেতে বললেন, কি মিথ্যুক! রোজ ঠাকুরের রান্না খেতে হয়, আমি একদিনও রাঁধি না?

দীপঙ্কর ছুটে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, ও কি, ও কি! স্বামীহত্যা। তার চেয়ে এই অধমকে বুক পেতে দিচ্ছি...

উনুনে মাংস চেপেছে এই মাত্র। বারাসতের বাগানবাড়িতে আজ চমৎকার মেঘের ছায়া। উত্তাপহীন কোমল বাতাস। ঝকঝকে বাড়িটার চার পাশে কেয়ারি করা ফুল বাগান, দক্ষিণ কোণে টলটলে জলের একটা ছোট পুকুর, তার পাড়ে

লাল সিমেন্টের বাঁধানো ঘাট। প্রশান্তদা'র মামাশ্বশুরের বিশ্রাম নিবাস। সেখানে আজ পিকনিক আমাদের।

মাংস ততক্ষণ সেদ্ধ হোক, পুকুর পাড়ে আমরা সবাই মিলে এসে বসলুম, পাঁচজন পুরুষ, চারটি মহিলা। আমরা পুরুষরা তাশ খেলায় সবে জমে উঠেছিলুম, মেয়েদের তাড়নায় উঠে আসতে হলো। রত্নাদি বললেন, এসো, আমরা সবাই মিলে একটা খেলা খেলি। পার্থবাবু আপনি ঐ দিকটায় বসুন, তপন আলোর ডান দিকে, শুভ্রা, তুই যা তারপর...

আমার মনটা প্রথম থেকেই খারাপ লাগছিল। পিকনিকে আসতে কার না ভালো লাগে, প্রশান্তদার আহ্বান পেয়ে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলুম। তাছাড়া প্রশান্তদা লোভ দেখিয়েছিলেন, খাবারদাবার ছাড়াও সঙ্গে থাকবে চিলড বীয়ার, জিন আর লাইম। অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে ভোর ছটায় দাঁড়িয়েছিলুম হাজরার মোড়ে —প্রশান্তদার কথা মতো। অঙ্গে আমার পিকনিকের উপযোগী রঙচঙে জামা, পকেটে মাউথ অর্গান নিয়েছিলুম, হঠাৎ ট্যাঙ্গো নাচের সঙ্গে বাজিয়ে সবাইকে ফুর্তি দেব। তখনো জানতুম না, পিকনিকে কে কে আসবে। প্রশান্তদা গাড়ি নিয়ে এলেন আমাকে হাজরার মোড় থেকে তুলতে, গাড়িতে আরো তিনজন রয়েছে, তার মধ্যে শুভ্রাকে দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল। বিয়ের পর শুভ্রা আরো রূপসী হয়েছে, লাল রঙের শাড়ি আর কাচের কল্কা বসানো লাল ব্লাউজে ওকে দেখাচ্ছে জ্বলন্ত শিখার মতন। ওর স্বামী পার্থবাবু খুব মাজা দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন, মুখে পরিতৃপ্ত মানুষের হাসি। সঙ্গে শুভ্রার ষোলো বছরের ননদ চন্দনা।

রত্নাদি বলেছিলেন, আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে পার্থ আর শুভ্রা, আর এ হচ্ছে—। শুভ্রা আমাকে স্পষ্ট না-চেনার ভান করল। আমি কিছু বলতে যাবার আগেই ও একটা শুকনো নমস্কার করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সেই যে আমার মন খারাপ হয়ে গেল, আর ভালো লাগল না কিছুই। মাউথ অর্গানটা আর বার করিনি, তাশ খেলাতেই আমার ভালো লাগছিল—কারণ তাশ খেলার সময় মুখ গুঁজে থাকা যায়। নইলে, শুভ্রার দিকে তাকালেই আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠেছিল।

রত্নাদি বললেন, শোনো, খেলাটার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। খেলাটার নাম অন্তাক্ষরী। প্রথমে একজন যে-কোনো একটা গান গাইবে—এক লাইন দু-লাইন গাইলেই হবে। তবে গানটা যেখানে শেষ হবে—সেই শেষের অক্ষরটা দিয়ে আরম্ভ করে পাশের লোককে আর একটা গান গাইতে হবে। বুঝিয়ে দিচ্ছি—মনে করো আমি গাইলুম, ইয়ে, কি বলে, যে কোনো গান, হ্যাঁ, ধরো, আমি গাইলুম, 'ওগো

কিশোর, আমি তোমার দ্বারে পরাণ মন জাগে';—এটা শেষ হলো 'গ' দিয়ে, পরের জনকে 'গ' দিয়ে আরম্ভ করতে হবে একটা গান—সবাই বুঝতে পারছ তো? আরম্ভ করা যাক—

আমি বললুম, রত্নাদি আমি তো গান জানি না। আপনারা বরং খেলুন, আমি বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখি।

রত্নাদি ধমকে উঠলেন, তোমাকে আর বেশি কবি-কবি ভাব দেখাতে হবে না। বসো চুপটি করে। গান আবার আজকাল কে না জানে। একটু সুর ভুল হলেও কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু সবাই শোনো—এক মিনিটের বেশি আমার সময় দেওয়া হবে না কিন্তু। আরম্ভ করো, তপন তোমার থেকেই...

তপন বলল, আমি গ দিয়েই শুরু করছি, 'গগনে গগনে আপনার মনে কি খোলা—আ, তবু গগনে গগনে'।

—'ন' দিয়ে। এর পর কে? পার্থবাবু, আপনার।

পার্থবাবু চোখ বুজে একটু ভেবে বেশ ভাব দিয়ে গাইলেন, 'নীল অঞ্জনে ঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অম্বর, হে গম্ভীর। হে গম্ভীর। বনলক্ষ্মীর কম্পিত কার চঞ্চল অন্তর—' পঙ্কজ মল্লিকের স্টাইলে খুব গম্ভীরভাবে গলা কাঁপাতে লাগলেন তিনি।

'ব' দিয়ে। মল্লিকা, এবার তুমি।

'ব' দিয়ে? 'র' দিয়ে?—মল্লিকা নামের মেয়েটি জলে পড়া মানুষের মতন ছটফট করতে লাগল—যেন, যত গান ওর মনে ছিল—সব এইমাত্র ভুলে গেছে। এটা সেটা গুনগুন করার চেষ্টা করে হঠাৎ গেয়ে উঠল, 'রাত ভরি বহনা, সবেরে চলি যানা, ও ঝুমকো মেরি মেরি'—

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, না, না, হিন্দী গান চলবে না। মল্লিকা বেচারী গাইতেই পারল না। র দিয়ে তার কোনো বাংলা গান মনে পড়ছে না। তার পাশ থেকে প্রশান্তদা গেয়ে উঠলেন শ্যামার গান, 'রাজার প্রহরী ওরা, অন্যায় অপবাদে, নিরীহের প্রাণ বধিবে বলে কারাগারে বাঁধে।'

দু' তিনজন পর আমার পালা এল 'আ' দিয়ে গাইবার। আমার সুর ওঠে না গলায়—কিন্তু গীতবিতানেব সমস্ত গানের প্রথম লাইন প্রায় আমার মুখস্ত। আমি আস্তে আস্তে ধরলাম, 'আজ কিছুতেই যায় না, যায় না, যায় না মনের ভার...মনে ছিল আসবে বুঝি...না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার।'

শুভ্রা চকিতে আমার দিকে একবার তাকাল, আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। একজনের পর শুভ্রার পালা আসতে সে গাইল অতুলপ্রসাদের গান—'ও কেন দেখা দিল রে! না দেখা ছিল যে ভালো। ও কেন দেখা দিল রে।' শুভ্রা আমার দিকে আর তাকায়নি, কিন্তু তার ঠোঁটের টেপা হাসি দেখে আমি বুঝতে পারলুম,

ও আমাকেই আঘাত দিতে চাইছে।

আমিও তৈরি হয়ে রইলুম, পরেরবার আমার পালা আসতেই গাইলুম, 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম, তুমি রবে নীরবে—'

শুভ্রার পালা আসতে শুভ্রা গাইল মায়ার খেলা থেকে 'ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে। জেগেছি, জেগেছি,—আর ভুল নয়, ভুল নয়।'

এর পর অনেকক্ষণ আর আমার পালা আসে না। আমি উসখুস করতে লাগলুম। পার্থবাবু আর রত্নাদি লম্বা লম্বা গান গাইতে লাগলেন। আবার আমার পালা আসতেই আমি শুভ্রার দিকে তীব্র চোখে তাকালুম। শুভ্রার ফরসা মুখে একটা লালচে আভা এসেছে, এক পলক আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। একটু যেন চোখের পাতা কাঁপল তার। আমি গাইলুম, 'বড়ো বেদনার মত বেজেছ তুমি হে, আমার প্রাণে। মন যে কেমন করে মনে মনে, তাহা মনই জানে।'

মল্লিকা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ন' দিয়ে একটা গান আমার মনে পড়েছে। আমি এবার গাইব। অনেকেই হেসে উঠল। নিজের যখন পালা আসে, তখন মল্লিকার কিছুতেই গান মনে পড়ে না। রত্নাদি বললেন, আচ্ছা, গাও। ঠিক আছে, মল্লিকা ধরল 'নীরবে থাকিস সখী ও তুই নীরবে থাকিস। তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা, তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস, নীরবে থাকিস সখী—।' শুভ্রা আর আমি দুজনেই মল্লিকার দিকে তাকালুম। মল্লিকা কি কিছু উদ্দেশ্য করে ও গানটা গাইছে? মল্লিকা শুভ্রাকে আগে থেকেই চেনে—কিন্তু আমাকে তো চেনে না। মল্লিকার সরল অতি-উৎসাহী মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তপন বলল, ইস, 'য' দিয়ে আরম্ভ হলো না। তাহলে এবার আমি গাইতুম, 'যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকাবনে।' আর এক লহর হাসি। শুধু শুভ্রা সে হাসিতে যোগ দিল না। ওর পালা আসতে শুভ্রা এবার একটু ভাবতে লাগল মাটির দিকে চোখ রেখে। রত্নাদি তাড়া দিলেন, এক মিনিট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। শুভ্রা হঠাৎ শুরু করল, 'বঁধু মিছে রাগ করো না, কোরো না। মম মন বুঝে দেখো মনে মনে, মনে রেখো, কোরো করুণা।...মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে যাই—সে আমার নহে ছলনা।'

আমার পালা আবার ফিরে আসবার আগেই রত্নাদি বললেন, মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে, ভুর ভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে, পোড়া না লেগে যায়। খেলা এখন বন্ধ থাক্।

আমি নিরাশ হয়ে বললুম, কেন, আর একটু চলুক না।

প্রশান্তদা বললেন, না, না, মাংসে পোড়া লাগলে সব মাটি হবে। আমি হাল্কাভাবে হাসতে হাসতে বললুম, কিন্তু আমি যে আর একখান গান গাইব বলে ঠিক করে রেখেছিলুম।

পার্থবাবু বললেন, কি মশাই। আপনি প্রথমে এ খেলাটা খেলতে চাচ্ছিলেন

না। এখন যেচে গান শোনাতে চাইছেন।

আমি আমার হাসি আরো তরল করে বললুম, কি করব, খুব জমে গেল যে খেলাটা। এখন বেশ ভালো লাগছে।

রত্নাদি বললেন, ঠিক আছে তোমার গানটা শোনাও, তারপরই খেলা শেষ হবে। আমি শুভ্রার দিকে আর তাকালুম না, রত্নাদির দিকেই তাকিয়ে গাইলুম, 'এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—এ-যে হৃদয় দহন জ্বালা সখী। এ-যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা—এ তো খেলা নয়...'

১৩

আমি ছেলেটাকে বললুম, যাও, যাও, কিছু হবে না। ছেলেটি তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি ফের ধমকে উঠলুম, বলছি তো কিছু হবে না। কেন বিরক্ত করছ ? অন্য জায়গায় যাও।

ছেলেটি বকুনি খেয়েও নড়ে না, ঠ্যাটা বেড়ালের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। আমি খুবই বিরক্ত হয়ে তাকে আরো প্রচণ্ড ধমক লাগাতে যাচ্ছিলুম, সে তখন আদুরে আদুরে গলায় বলল, আমাকে দিদিমনি দেবেন, দিদিমনি আমাকে রোজ দ্যান।

সুপর্ণা যে তখন ব্যাগ খুলে খুচরো পয়সা খুঁজছে লক্ষ্য করিনি। আমাকে চুপ করে যেতে হলো। সুপর্ণার হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতর থেকে বেরুল আর একটা ছোট ব্যাগ, তার এক খোপ থেকে একটা পাঁচ পয়সা দুই লীলায়িত আঙুলে তুলে ভিখারি ছেলেটিকে দিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, এবার যাও।

আমি বক্র হেসে ছেলেটিকে বললাম যাও এবার আর একজনকে পাঠিয়ে দাও।

সুপর্ণা বলল আর কেউ এলে দেব না। এই ছেলেটা রোজ আমার কাছ থেকে পাঁচ পয়সা নেবেই কিছুতেই ছাড়বে না।

আমি বললাম, তুমি শুধু ওকেই ভিক্ষে দাও, আর কারুকে দাও না। তোমার এই পক্ষপাতিত্ব কেন ?

—যখন বেশি খুচরো থাকে, তখন অন্যদেরও দিই। দেওয়াই তো উচিত সবার। সব সময় অবশ্য পারা যায় না।

বহুক্ষণ সুপর্ণার সঙ্গে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা ফাঁকা। মনে হচ্ছে যেন ট্রাম-বাসেরা এ রাস্তার কথা ভুলেই গেছে। কিংবা হঠাৎ বাস-ট্রামে ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

সুপর্ণা জিজ্ঞেস করল, আপনি ও ছেলেটিকে ওরকম ধমকাচ্ছিলেন কেন ?

ও তো কোন দোষ করেনি। শুধু ভিক্ষে চাইছিল।

—আমি কমপিটিশন সহ্য করতে পারি না।

—কি? তার মানে?

—কিছু না। একথা এখন থাক্।

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়েছি। মেজাজ ঠিক থাকছে না। ভিখারি-বালক নিয়ে আলোচনা করার উৎসাহ নেই। সুপর্ণা কিন্তু মুখে বেশ মিষ্টি হাসিটা ফুটিয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ওকে ওর নিজের চেহারার চেয়েও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে এখন।

সুপর্ণা বলল, গরীব দুঃখীদের সঙ্গে যদি কেউ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তাহলে আমার খুব খারাপ লাগে। এমনিতেই তো সব সময় নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়। আমি খেতে পাচ্ছি, থাকার জায়গা পেয়েছি, ইচ্ছে মতন শাড়ি-টাড়ি কিনতে পারি —আর কত হাজার হাজার মানুষ এখনো দু'বেলা খেতে পায় না—

আমি মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বললুম, এই জন্যই তোমাকে আমার এত বেশি ভালো লাগে। তোমার মনটা একেবারে হীরের টুকরো—

—বাঃ। এ তো খুব সাধারণ কথা। কিন্তু আপনি যে আজ ছেলেটার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলেন, তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি।

—কেন?

—নিষ্ঠুরতা আপনাকে মানায় না।

—আমাকে কোন ভূমিকায় মানায়?

—আপনিই একদিন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে একটা বুড়ো ভিখিরিকে এক সঙ্গে অনেকগুলো খুচরো পয়সা দিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বাঃ। কবে? মোটেই না।

—হ্যাঁ দিয়েছিলেন।

—হতেই পারে না।

—আমার ঠিক মনে আছে। মাস দেড়েক আগে। সেদিনও আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

একটু একটু যেন আমার মনে পড়ল। বললাম, তা হতেও পারে। বুড়োটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল হাত পেতে। কারুর কাছ থেকে কিছু চায়নি। শুধু হাতখানা বাড়ানো ছিল—তার মুখখানা আঁকিবুকিতে ভরা—পুরোনো দলিলের মতন, হয়তো দেখে আমার মায়া হয়েছিল, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—সেদিন মায়া হয়েছিল, আর আজ...

—সুপর্ণা, আমাকে কি প্রত্যেকদিন এক ভূমিকায় মানায়? আমি তো সাধারণ

মানুষ। মহৎ মানুষেরাই অনবরত দয়ালু হয়। আমি তো নই, আমার শরীরে খানিকটা দয়া-মায়া আছে বটে, আবার রাগ, ঈর্ষা, বিরক্তি—এসবও আছে। আমি কখনো সামান্য দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ি, কখনো কঠোর নির্মম হতেই ভালো লাগে। একই মানুষ বিভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্ন রকম।

—আপনি বড্ড বড়ো বড়ো কথা বলেছেন। আমি যা বললুম, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ? দীন-দুঃখীদের সাধ্যমত দু-চারটি পয়সা দিতে সবারই ভালো লাগে—

—চলো বাস এসে গেছে।

—এ বাসে বড্ড ভিড়। এটাতে উঠব না।

—তা হলে হেঁটে যাওয়া যাক্।। কিংবা ট্যাক্সিতে উঠবে ?

—ট্যাক্সি ? একটু আগে আপনি একটা ভিখিরিকে দুটো পয়সা দেননি—এখন ট্যাক্সিতে যেতে চাইছেন।

—আরেঃ যাঃ। তুমি খালি ঐ ভিখিরি ছেলেটার কথা তুলছ কেন ?

—ভিখিরিদের কেউ মুখঝামটা দিলে আমার বড়ো কষ্ট হয়। ঐ ছেলেটাকে দেখে আপনার মায়া হলো না ?

—না।

—না! কি রকম করুণ আর মিষ্টি মুখটা—ওকে দেখে আপনার মায়া হলো না?

—না। কারণ পাশাপাশি দুজন ভিখিরি থাকলে একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারে না। ওর সঙ্গে আমার বিরাট প্রতিযোগিতা—আমি তো চেষ্টা করবই ওকে হটিয়ে দিতে।

—ও আবার কি কথা ?

—ও চাইছিল দু-চারটে পয়সা, আর আমি তোমার করুণাব ভিখারি। তোমার একটু কৃপা পাবার জন্য আমি কতক্ষণ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমার দিকে চেয়ে যদি একটু হেসে—

সুপর্ণা কুলকুল করে হাসল। তবে এ হাসি অন্য রকম। আমি ঠিক এর কথা বলিনি, এর মধ্যে খানিকটা ঠাট্টা মিশে আছে। বলল, যাঃ, আপনি যে কি পাগলের মতো উল্টোপাল্টা বলেন ?

আমি বললাম, আজ ঐ ভিখারি ছেলেটাই জিতে গেছে। ও শুধু তোমার কাছ থেকে পয়সাই পায়নি—ও তোমার মনোযোগও পেয়েছে। তুমি সর্বক্ষণ ওর কথাই বলছ।

—আপনার জন্যই তো! আপনি যদি ওকে দু-চারটে পয়সা দিয়ে বিদায় করতেন ও আর দাঁড়াত না। এ নিয়ে কোনো কথাই বলত না।

আমি বললাম, আমার কি রকম লজ্জা করে।

—লজ্জা করে মানে?

—লজ্জা করে তো কি করব? অধিকাংশ লোকই ভিখিরিকে ভিক্ষে দেয় —তার প্রতি মায়াবশত নয়। তাকে বিদায় করবার জন্য। ভিখিরিরা পাশে দাঁড়িয়ে ঘ্যানঘ্যান করে—তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য দু-চারটে পয়সা দিতে হয়। সে রকম দিতে আমার লজ্জা করে। একটা মানুষের আত্মাকে অবহেলা করতে কিংবা অপমান করতে আমার লজ্জা হয়। কিংবা ধরো, কখনো কোনো ভিখিরিকে দেখে মনটা উদার হয়ে গেল, পকেট থেকে খুচরো পয়সা তুলে তাকে দিয়ে দিলাম —সে আমাকে আশীর্বাদ করল। সেই আশীর্বাদটা পেয়ে আমার লজ্জা হয়। মনে হয় ওটা আমার প্রাপ্য নয়। আমি তো সত্যিই দাতা নই।

—বাবারে বাবা। ভিখিরিকে দুটো পয়সা দেবেন, তার জন্য আবার এত কথা। এর জন্য এত ভাবতে হবে কেন?

—সেই তো, তার থেকে না দিলেই চুকে যায়।

—আসলে আপনি কিপ্টে, সেই কথা বলুন।

—কে বলেছে কিপ্টে। চলো, তুমি কোন রেস্টুরেন্টে খাবে—তোমাকে সেখানে ট্যাক্সিতে...।

দর্পিত ভ্রুভঙ্গি করে সুপর্ণা বলল, মোটেই আমি যাব না কোথাও। শুধু শুধু ঐ ভাবে পয়সা নষ্ট করা—আর কত মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কত মানুষ ফুটপাথে...

সুপর্ণা যে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরায় খেতে ভালোবাসে না, তা নয়। ট্যাক্সি চড়তেও পছন্দ করে। অন্য মেয়েদের মতোই। কিন্তু আজ কথা প্রসঙ্গে সে মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় বড়ো কাতর হয়ে পড়েছে, এই কাতরতার ছায়ায় তার মুখখানি উদ্ভাসিত। এখন তার সৌন্দর্য অন্যরকম। এটা দেখার জন্যই আমি ওকে খোঁচাচ্ছিলুম। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কেউই সঠিক পথে ভাবছেন না মনে হয়—প্রায় সকলকেই শৌখিন মনে হয়। তবু কখনো কখনো মুখে এই কাতরতার ছায়া দেখতে ভালো লাগে। আমি বললুম, এসো, তাহলে আজ সন্ধেটা অন্যভাবে কাটান যাক। আমার কাছে টাকা দশেক আছে, আর তোমার কাছে যা আছে, সব মিলিয়ে খুচরো করে রাস্তাব সব ভিখিরিদের বেলানো যাক।

সুপর্ণার মুখে তখনো হাসি ফিরে আসেনি। সন্দেহের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বুঝি এটাকে এখনো ঠাট্টা মনে করছেন?

আমি বললুম, না, ঠাট্টা নয়। আমি জানি এতে একজনেরও খিদে মেটানো যাবে না। কিন্তু এক সন্ধের জনা আমরাও ভিখিরি হয়ে যাই। আমি তো জন্মভিখারি, আমার কাছে এর নূতনত্ব খুব নেই, কিন্তু তোমাকে ভিখারিনী হিসেবে কেমন মানায়—সেটা দেখতে ইচ্ছে করছে।

১৪

সন্ধেবেলা রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটছিলাম। কোথাও যাবার নেই, উদ্দেশ্যহীনভাবে এলোমেলো পথ চলা। উদ্দেশ্যহীন হলেই খুব নিঃসঙ্গ লাগে। মনে হয়, এখন সবাই কলকাতায় খুব ব্যস্ত, সবাই কিছু না কিছু নিয়ে মেতে আছে। একমাত্র আমারই কোনো কাজ নেই। আর সবাই আমাকে ভুলে গেছে, আমি পরিত্যক্ত বন্ধুহীন।

এক-একদিন সন্ধেবেলা এরকম হয়, এরকম মন খারাপ লাগে, শরীরটা হাল্কা হয়ে যায়, বাতাসে ভাসা তুলোর বীজের মতন অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যাওয়ার অভ্যেস আমার কিছুতেই হলো না। মধ্য-কলকাতা থেকে সন্ধের সময় বাড়ি ফেরা মোটেই সহজ কাজ নয় অবশ্য। ট্রামে-বাসে অসহ্য ভিড়, ঐ ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে বাড়ি ফেরা একটা অসম্ভব ব্যাপার! তাও তো বহু লোক বাড়ি ফেরে, নইলে আর ট্রাম-বাসে এত ভিড় হয় কেন? সন্ধেবেলা নিজের বাড়িতে ফিরে লোকেরা কি করে, আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়। সারাদিন অফিস-টপিসে বন্দী থাকার পর আবার সন্ধেবেলা থেকেই গৃহবন্দী?

এতদিন আছি, তবু কলকাতা শহরটা আমার কাছে পুরোনো হয়নি। এখনো নির্লজ্জের মতন বলতে পারি, এই শহরকে আমি ভালোবাসি। কোনো মেয়েকে এখন আর ভালোবাসার কথা বলা যায় না, সে-রকম আর ফ্যাশান নেই, কিন্তু এই শহরকে ভালোবাসার কথা বলতে দ্বিধা হয় না। সারা পৃথিবীর লোক যখন কলকাতার নিন্দে করছে, তখনো আমি একে ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরতে চাই। কলকাতার বাইরে যেখানেই যাই, কিছুতেই মন টেঁকে না, দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসার জন্য মন ছটফট করে। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক বড়ো শহরের ছবি আমি দেখেছি, আমার চোখে তারা ফিলম স্টারের মতন, তাদের চটক আছে, কিন্তু তাদের ভালোবাসা যায় না।

একা হাঁটতে হাঁটতে আমি মনে মনে দু'লাইন কবিতা বিড়বিড় করছিলাম। পুরোনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে, কেউ বা আগ্রায় কেউ দিল্লির আনাচে-কানাচে। অরুণকুমার সরকারের কবিতা, বহুদিন আগে যখন পড়েছিলাম, তখন এ লাইনগুলো আমার কাছে সত্যি ছিল না, এখন মর্মান্তিক সত্যি। এই যে সন্ধেবেলা আমি একা একা হাঁটছি, একজন কোনো বন্ধুর কথাও মনে পড়ে না, যার সঙ্গে এখন দেখা করতে যেতে পারি। কারুর বাড়িতে গিয়ে দেখা করা কিংবা গল্প করার স্বভাব আমার কোনোদিনই ছিল না—আগে এমনিই হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যেত—এখন তারা সবাই বাড়ি ফিরে গেছে, আমি একা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি।

'পুরোনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে, কেউ বা আগ্রায় কেউ দিল্লির আনাচে কানাচে...।' অনেক বন্ধু সত্যিই দিল্লি-আগ্রা-কানপুর-বোম্বাই চলে গেছে

চাকরির জন্য, মাঝে মাঝে সেসব জায়গায় গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে সত্যিই তারা গম্বুজ হয়ে আছে কি না। ভাস্কর তখন বিলেত যাচ্ছিল এয়ারপোর্টে ওর হাত ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন মরতে যাচ্ছিস ওখানে ? কি হবে কি ? ভাস্কর মৃদু হেসে বলেছিল, দ্যাখ না, বেশিদিন থাকব না— বিলেতে আমার নামে একটা রাস্তা বানিয়েই চলে আসব। তারপর সাত-আট বছর কেটে গেল। কলকাতার প্রতিটি অলিগলি ওর চেনা ছিল, এখন বিলেতে কোন বিরাট নামের রাস্তায় ও হারিয়ে গেছে জানি না। আমার ধারণা ভাস্কর ওখানে রোড ইনস্পেক্টরের কাজ নিয়েছে, রাস্তা মেরামতির তদারকি করছে এখনো, রাস্তা বানাবার সুযোগ পাচ্ছে না।

একসময় সন্ধেবেলা আমি টিউশানি করতাম। বন্ধুদের কি ঘোরতর আপত্তি ছিল তাতে। হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপে অস্থির করে তুলত আমাকে। প্রায়ই যাবার পথে হাত ধরে আমাকে আটকে রাখত, চলন্ত বাস থেকে টেনে নামাতো। ছাত্রের বদলে ছাত্রীদের পড়াতুম বলে বন্ধুদের আরো বেশি উৎসাহ ছিল আমাকে না-যেতে দেবার। কিংবা, একথা বলা হয়তো ঠিক হলো না, আড্ডা মারাটাই ছিল তাদের প্রধান আকর্ষণ, একজন আড্ডাধারীর অনুপস্থিতিও সহ্য হতো না ওদের। প্রায়ই ডুব মেরে পরের দিন ছাত্রীদের বাড়িতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা আমাকে বলতে হতো।

যে-কদিন যেতাম, ফিরতাম রাত সাড়ে আটটা আন্দাজ। তখন বন্ধুবান্ধবরা কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। কিন্তু একজন করত। এলগিন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত আমার বন্ধু বুঢ়্ঢা। আমি তো কোনো না কোনো বাসে ফিরবই, তাই সাড়ে আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত এলগিন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে বুঢ়্ঢা প্রত্যেকটা বাস থামতেই চেঁচিয়ে উঠত, এই নীলু, নেমে আয়! নেমে পড়ে ওকে জিজ্ঞেস করতাম, কিরে, এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

বুঢ়্ঢা মুখ-চোখের একটা বিরক্ত ভঙ্গি করে বলত, দূর ছাই, ভালো লাগে না এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে।

—এত তাড়াতাড়ি কি বলছিস! এখন তো ন'টা বাজে!

—ধ্যাৎ! এই তো কলির সন্ধে!

রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি আড্ডা দিতাম, কে জানে! তবু কথা ছিল অফুরন্ত। প্রত্যেক রাতে বাড়ি ফিরেই মনে হতো কাল আবার কখন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। সেই বুঢ়্ঢা এখন আছে লিবিয়ায়, জানি না সেখানে সে এখন কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে! আমি কলকাতার রাস্তায় একা একা হাঁটছি।

বাবা আমাকে কো-এডুকেশানাল কলেজে পড়তে দেবেন না বলে আমি বাধ্য হয়ে ভর্তি হলুম বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক বাজার-মার্কা কলেজে। আমার

বন্ধু আশু শুধু আমারই জন্য সেই কলেজে চলে এল। ওর রেজাল্ট ভালো, অবস্থা ভালো, বাড়ির আপত্তি নেই—ও অনেক ভালো কলেজে পড়তে পারত—শুধু আমার সঙ্গে পড়বে বলেই চলে এসেছিল ঐ দূরের কলেজে। একদিনের বিচ্ছেদও সহ্য হতো না। তখন আমরা ভাবতাম, সারা জীবনে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—সব সময় পাশে পাশে থাকব। এখন আশু এই কলকাতা শহরেই আছে, অথচ কারুর বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশন ছাড়া দেখা হয় না।

একটা বয়েস ছিল যখন আমরা কেউ মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার সময় পেতাম না। আমরা কয়েকজন পুরুষ মিলে এমন নিবিড় বন্ধু ছিলাম যে আলাদা ভাবে কেউ যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেত সেটাকে মনে করতুম অপরাধ। আমি কখন কোথায় আছি—বন্ধুরা তা সব জানে। প্রেমে পড়তে হলেও যেন এক সঙ্গে পড়তে হবে। পড়তুমও তাই, অনেক সময় একটি মেয়ের জন্য পাঁচজনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতুম, একটি মেয়ের জন্য পাঁচজনের বুক কাঁপত, একজনকে খুশি করার জন্য পাঁচজনে ব্যগ্র হতুম। আলাদা কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলে তার কথা বন্ধুদের কাছ থেকে লুকোবার জন্য কি দারুণ উৎকণ্ঠা —বাড়ির লোকের কাছ থেকে লুকোবার জন্যও এত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়নি। আবার, প্রেমের ব্যাপারে কোনো সংকট দেখা দিলে—বন্ধুদের কাছেই সাহায্য চাইতে হতো—তখন কারুর কোনো ঈর্ষাবোধ ছিল না। আমার যদি লেখার ক্ষমতা থাকত, কলকাতা শহরের বন্ধুত্ব নিয়ে থ্রি কমরেডস-এর মতন আর একখানা দুর্দান্ত উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতাম। হায়, আমার সে রকম লেখার ক্ষমতা নেই!

প্রত্যেক বন্ধুর মা-ই ভাবতেন, তাঁর ছেলেটি খুব ভালো—বাকি বন্ধুরাই ছেলেটির মাথা খাচ্ছে, পড়াশুনা করতে দিচ্ছে না, চাকরিতে উন্নতি করতে দিচ্ছে *না। বন্ধুদের মায়ের সামনে পড়লেই আমি কাচুমাচু হয়ে যেতুম, মুখে একটা* অপরাধীর ভাব ফুটত। তেমনি, আমার মায়ের সামনে অন্য বন্ধুদের। কিন্তু মা-বাবারা হাজার চেষ্টা করেও যা পারেননি, সময় তা পেরেছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কেউ চাকরির জন্য, কেউ বিয়ে করার কুফলে, কেউ অন্য ধান্ধায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে চতুর্দিকে। আমি যেমন কলকাতার রাস্তায় বিষণ্ণভাবে একা একা হাঁটছি, তেমনি ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য বন্ধুরা কেউ হয়তো লিবিয়ায় কিংবা বিলেতে কিংবা দিল্লিতে একা একা হাঁটছে মন্থর পায়ে।

রেড রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এ কথা মনে পড়ায় হঠাৎ একবার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বন্ধুদের নাম ধরে ডাকি। যেন আমার চিৎকার ডাল্টনগঞ্জ কিংবা কানাডাতেও পৌঁছে যাবে। চিৎকার করে বলি, বুঢ্ঢা, আশু, উৎপল, ভাস্কর,

সমীর, শরৎ—আর, আর একবার চলে আয় সবাই! আয়, পুরোনো কালের মতন আর একবার আমরা কলকাতা শহরটাকে তোলপাড় করি! আগে পাঁচ-সাত জনে মিলে যেমন একটি মেয়েকে ভালোবাসতুম, তেমনি ভাবে এই কলকাতাকে সবাই মিলে ভালোবাসি।

কিন্তু নাম ধরে ডাকার ইচ্ছে হতেই, আমার এত বন্ধুদের বদলে শুধু সৌমেনের কথাই বেশি করে মনে পড়ল। এক সরস্বতীর পুজোর দিন আমরা সবাই মিলে এক বাড়িতে বসে গুলতানি করছিলাম, সৌমেনের আসার কথা ছিল, সে আসেনি বলেই আমরা বেরুতে পারছিলাম না। সৌমেন থাকত হাওড়ায়। দুপুর ঘোর হয়ে এল, তবু সৌমেন এল না, আমরা সবাই রেগে খুব গালাগালি করছিলুম ওকে! বিকেলেও সৌমেন এল না, কিন্তু ওর খবর এল।

ধুতিটাকে লুঙ্গি করে জড়িয়ে পরেছিল সৌমেন, পাশের বাড়ির বাচ্চারা সরস্বতী পুজো করছে, সেখানে অঞ্জলি দিয়েই বেরুবে, উঠোনের পাঁচিলের পাশে উঁকি দিয়ে দেখছিল—পুজো শেষ হতে কত দেরি। আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল সৌমেন, বারবার তাড়া দিচ্ছিল ওদের। কাছেই ছিল একটা তোলা উনুন, তার আগুন লেগে যায় সৌমেনের ধুতিতে। ধুতিটা চট করে খুলে ফেলতে পারত, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে পারত—কিন্তু চরম সময়ে নাকি কিছুই মনে আসে না, সৌমেন আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, মা, মা—। আগুন তখন দপ্ করে ছড়িয়ে গেছে সারা গায়। সৌমেনের মা তা দেখে অস্বাভাবিক ভয় পেয়ে বুদ্ধিভ্রান্ত হয়ে এক বালতি জল ছুঁড়ে দিলেন। তাতে আগুন নিভল না, ফল আরো খারাপ হলো। তারপর দু'দিন একটা কথাও বলতে পারেনি, যেটুকু সময় জ্ঞান ফিরেছে, শুধু চেঁচিয়েছে, জ্বলে গেলুম।— আড্ডা দেওয়া হলো না সৌমেনের, একটা অতৃপ্তি নিয়ে চলে গেল।

বহুদিন সৌমেনের কথা মনে পড়েনি। আজ মনে পড়তেই বুকটা ভারী হয়ে এল, গলার কাছে ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। ফিসফিস করে বলতে লাগলুম, সৌমেন, সৌমেন, তুই কোথায় আছিস? শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? আয়, আর একবার প্রাণভরে আড্ডা দিই।

সন্ধেবেলা একা ছিলুম বলে মৃত বন্ধুর কথাই বেশি মনে পড়তে লাগল।

১৫

ভ্রমণকাহিনী পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। গল্প উপন্যাস পড়ে প্রায়ই নিরাশ

হতে হয়, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীতে সে সম্ভাবনা নেই। লেখাটা ভালো হোক বা না হোক—কিছুক্ষণের জন্য তো সেই বর্ণিত জায়গাটায় মনে মনে ঘুরে আসা যায়।

আমার নিজেরও ইচ্ছে করে একটা ভ্রমণকাহিনী লিখে ফেলি। কিন্তু কোন জায়গার কথা লিখব, কোনো দুর্গম পাহাড়ে কিংবা অচেনা জনপদে তো যাওয়া হয়নি, দেখা হয়নি এই পৃথিবীর কত রহস্য, মনোহারিনী শোভা আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেল। বছরের পর বছর কলকাতা শহরেই বন্দী হয়ে আছি। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী লেখার খুবই সাধ আমার। তাই ঠিক করলুম, কলকাতা শহরের একখানা ভ্রমণকাহিনী নিয়ে হাতে খড়ি করা যাক।

এক নাতিশীতোষ্ণ অপরাহ্ণে, খাঁটি পরিব্রাজকের মতন সঙ্গে কিছু মালপত্র না নিয়ে, পকেটে সামান্য কিছু টাকাকড়ি, আমি কলকাতার পাইকপাড়া অঞ্চলে একটি নীলরঙা দোতলা বাসে উঠে বসলুম। বাসটি সেখান থেকেই ছাড়ে, সুতরাং বেশ ফাঁকা ছিল, দোতলার জানলার পাশে একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত আসন পাওয়া গেল! সেই দিনই যে ভ্রমণ করার খুব একটা ইচ্ছে আমার ছিল তা নয়, জীবনে অনেক মহৎ কার্যের মতন আমার সেই অপরাহ্ণ-ভ্রমণও আকস্মিক। আমার উদ্দেশ্য, শিয়ালদহ নামক অঞ্চলে নেমে কোনো একটি কর্তব্য সমাপন, কিন্তু তা বদলে গেল কার্যকারণবশত। সূত্রপাত হলো এই ভাবে যে, বাস ছাড়বার আগেই বিড়িতে শেষ টান দিতে দিতে কণ্ডাক্টর মহোদয় টিকিট গুচ্ছে আঙুল চালিয়ে আমার নাকের সামনে এনে এক প্রকার উৎকট শব্দ করতে লাগলেন। আমি তখন পথের সৌন্দর্য নিরীক্ষণে ব্যস্ত ছিলুম। সেই শব্দে চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, কি ? তিনি বললেন টিকিট, আমি জামার পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত পাঁচ টাকার নোটটি এগিয়ে দিলাম। কণ্ডাকটর সেদিকে পলকের মাত্র চাহনি দিয়ে বিরক্ত-মিশ্রিত স্বরে বললেন, পাঁচ টাকা ? নেমে যান!

আমি হতবাক।

আমার বরাবরই কলকাতা শহরের বাসের ভাড়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। ধরা যাক, একশো মাইল দূর থেকে কেউ ট্রেনে চেপে কলকাতা শহরে আসতে চায়। তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলে ভাড়া তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছ'টাকা, প্রথম শ্রেণীতে প্রায় বারো টাকা দিতে হবে। একই দূরত্ব একই ট্রেন, শুধু আসনের আরাম অনুযায়ী বিভিন্ন দাম। অথচ কলকাতায় শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জগামী বাসে যারা হাতল ধরে ঝুলছে, যারা ভিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে, যারা অস্থায়ী মহিলা আসনে বসে সদা কম্পিত, যারা জানলার পাশে নিশ্চিন্ত আরামে আশ্রয় পেয়েছে সকলেরই টিকিটের ভাড়া এক হয় কি প্রকারে ? সুতরাং আমার মনে হলো কর্তৃপক্ষের বুঝি এতদিনে চেতনা ফিরেছে। দোতলার জানলার ধারের আসনকে এয়ারকণ্ডিশনড কামরার মর্যাদা দিয়ে

ভাড়া বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কত ভাড়া? কণ্ডাকটরটি পুনশ্চ বিরক্তিভরে বললেন, বললুম তো খুচরো নেই। নেমে যান! নেমে যান।

শাস্ত্রে আছে, যেসব মানুষের শরীর অত্যধিক রোমশ হয়, যাদের বর্ষাকালে জন্ম, যাদের শরীর রোগা নয়, আবার খুব স্থূলও নয়, যাদের চোখ বড়ো কিন্তু নাক ছোট, যারা দ্রুত স্নান সারে কিন্তু খাবার খেতে দেরি করে, যারা দিনে ঘুমোয় কিন্তু অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে,—সেই সব মানুষ অত্যন্ত গোঁয়ার প্রকৃতির হয়। আমার সঙ্গে এর প্রত্যেকটার মিল থাকা সত্ত্বেও আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ হিসেবে তেমন পরিচিত নই। কিন্তু এক নিরুপদ্রব বিকেল বেলা নিশ্চিত ভাবে বাসের জানলায় বসেছি, এমন সময় আমার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলেই 'নেমে যান' বলায় চড়াৎ করে আমার মেজাজ সপ্তমে উঠল। একবার বললেও হয়ত অতটা মনে করতুম না, কিন্তু পরপর দুবার নেমে যান নেমে যান্ আমার কানে অতিশয় রুক্ষ শোনাল। তখন আমি স্থির ভাবে বললুম, আমি নেমে যাব না, আমি এখানেই বসে থাকব। এই বাস যতদূর যায় ততদূর যাব তার মধ্যেও যদি আপনার খুচরা না হয়—তবে এই বাস যতবার আজ যাতায়াত করবে আমি এখানেই বসে থাকব—যদি তাতে পাঁচ টাকার পুরো ভাড়া হয়!

অতএব, এরপর আমার যাত্রার আর কোনো উদ্দেশ্য রইল না, আমি ভ্রমণকারীর মতন নিরাসক্ত ভাবে বসে রইলুম। অন্যদিন কাজের জন্য বাসে চাপতে হয়, তখন তাড়া থাকে কতক্ষণে পৌঁছুব। আজ সে রকম কিছু নেই বলেই অনেক কিছু চোখে পড়তে লাগল।

পাইকপাড়ার রাজারানীদের স্মৃতিমণ্ডিত রাস্তা ধরে বাস ছুটছিল, অচিরে তা দুবার ডানদিকে বেঁকে বেলগাছিয়ায় এসে পৌঁছুলো। বেলগাছিয়ার রাস্তাটুকু অতিশয় অভিনব। এখানে বাস কিছুক্ষণ ঘোড়ার চাল অনুকরণ করে। প্রতি কদমে বাসটি লাফিয়ে উঠছে ও ডান দিকে বাঁ দিকে হেলছে—সেই অনুযায়ী যাত্রীরাও, একবারে সামনের আসনে কয়েকটি শিশু ছিল, তারা আনন্দ খলখল করতে লাগল। আমার মনে পড়ল অতি শৈশবে দার্জিলিং গিয়ে বাবার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে আমারও এই প্রকার আনন্দ হয়েছিল। যে-সব বাচ্চারা আজকাল দার্জিলিং যেতে পায় না তাদের আনন্দের জন্যই বোধহয় বেলগাছিয়ার রাস্তায় এই বন্দোবস্ত। তারপরই বাসের নৃত্য থামল, জলের সর সর শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি ব্রিজের পাদদেশ সম্পূর্ণ জলমগ্ন। গত পুজোর পর আর একদিনও বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়ে না—কিন্তু বেলগাছিয়া ব্রিজের কাছে কোমর জল, বাস তার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল। কলকাতার বাসগুলি সত্যিই বাঘের বাচ্চা, জল-স্থলের

কোনো বাধাই তারা মানে না, মনে হয় শূন্য পথেও তারা যাতায়াতে পারঙ্গম। এক মহিলা সেই কোমর জলে রিক্সা চেপে আসছিলেন, রিক্সা থেকেই তিনি বাসের পা-দানিতে লাফ দিয়ে পড়লেন।

বাস ব্রিজের ওপর উঠল। এবার দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। ব্রিজটি বেশ উঁচু, দূরে অনেক নীচে শ্যামবাজারের গমগমে জনতা। ব্রিজের দু'পাশে বহু আঁকিবুকি কাটা রেল লাইন—দিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতা, মেদুর সন্ধ্যা তার ওপর ঝুঁকে আসছে। ডানধারে পার্শ্বনাথের ঠাণ্ডা ছিমছাম মন্দির, ভিতরে জলাশয়, তার আশেপাশে সুবেশ নর-নারী। বাঁদিকে একটি শিব মন্দিরের শুধু চূড়াটুকু উঠে আছে, তার ওপর প্রাইভেট বাসের কণ্ডাকটবরা কি কারণে যেন পয়সা ছুঁড়ে দেয়। বাস এখানে একবার শরীর ঝাড়া দিল, যেন শহরতলি ছেড়ে শহরে ঢুকবার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে। শ্যামবাজারে এসে থামা মাত্র একটা বিশাল ভিড় বাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সার্কুলার রোডের একটি বিশেষত্ব আছে —এতদিন চোখে পড়েনি। সার্কুলার রোডের বাঁ পাশে প্রায়শই বস্তি, কিন্তু ডান পাশে সবই প্রায় পাকাবাড়ি। সার্কুলার রোডের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এত বস্তি কেন, বস্তির বদলে ব্যারাক বাড়ি তুলে দিলে স্থান সঙ্কুলান হতো—এসব কথা তুলছি না। একটা রাস্তার একদিকে বেশি বস্তি অন্যদিকে বেশি পাকা বাড়ি—এর কারণ কি ? তখন মনে হলো, হয়তো কলকাতার প্রাচীনকালের চিহ্ন এখানে এখনো রয়ে গেছে। সার্কুলার রোড তো খাল ভরাট রাস্তা। বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে যে খাল কাটা হয়েছিল—সেটাকেই পরে বুঁজিয়ে রাস্তা হয়েছে। অর্থাৎ এই রাস্তাটার ডান দিকে ছিল কলকাতা শহর, বাঁ দিকে গ্রাম—বাঁ দিকের বস্তিগুলোর এখনো বোধহয় সেই গ্রামের চিহ্ন রয়ে গেছে।

শিয়ালদহে এসেও আমার মন কেমন করল না। বিবাগী হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি—আজ আর কর্তব্যকর্ম থাক। ইতিমধ্যে পুরোনো যাত্রীরা অধিকাংশ নেমে গিয়ে নতুন যাত্রীদল উঠেছে। এক এক এলাকার যাত্রীদের পোশাকেও কিছু কিছু সূক্ষ্ম তফাৎ আছে—কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। মৌলালি থেকে বাঁ দিকে ঘুরতেই দৃশ্য আমূল বদলে গেল। এ এক নতুন কলকাতা। ঝকঝকে পরিষ্কার দু'পাশের বাড়িগুলি নতুন, জানলার পরদায় হরেক শোভা, বারান্দায় রেলিং ধরে ঝোঁকা মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী, পুরুষদের পায় হরিণের চামড়ার চপ্পল। পথও দুভাগ করা, মাঝখানে সবুজ ঘাসের নর-চারণ ক্ষেত্র। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরোন, তখন তাঁর গুরু অ্যারিস্টটল নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীর যত জায়গাতেই যাও, মানুষের মতন এত আশ্চর্য জিনিস আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং বাসের জানলায় বসে আমি যে শুধু প্রাকৃতিক

দৃশ্যই দেখছিলুম, তা নয়, দোতলায় প্রত্যেক যাত্রীর ওঠা-নামা এবং ধরন-ধারণও লক্ষ্য করছিলুম। তাছাড়া, আজকালকার ভ্রমণকাহিনীতে একটি সুন্দরী নায়িকা এবং দুটো-একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা না থাকলে জমে না। আমার এ ভ্রমণ-কাহিনীতেও তার অভাব নেই, যথা সময়ে বলছি।

বাস তখন ভিড়ে ভর্তি, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের দুটি আসনই ভর্তি, তাছাড়াও দু-একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি বসেছি অনেক দূরে, সেখান থেকে হঠাৎ শিভালরি দেখাবার অবকাশ নেই। আমার পাশে আগাগোড়া বসে আছে একজন হিন্দুস্থানী, তার প্রতি আমার রাগের উদ্রেক হবার কোনোই কারণ নেই, কিন্তু তাঁর কাঁধে একখানি ময়লা গামছা। আমার বারবার তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, এই ভর সন্ধ্যাবেলা তুমি কি বাসে চেপে কোথাও স্নান করতে যাচ্ছ ? তা যদি না হয় তবে ঐ মহামূল্য গামছাখানা বাড়িতে রেখে এলে কি তুলসীদাসের রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যেত ? আমার সামনেও সীটের দুজন প্রৌঢ় অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় পঞ্চাশ হাজার কিংবা ষাট হাজার টাকার কি একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। পিছনের সীটে দু'জন যুবক ভারতের ক্রিকেট ভাগ্য নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত। একেবারে সামনের সীটে বসা এক ভদ্রলোক একেবারে পিছনের সীটে বসা একজন চেনা লোককে দেখে চিৎকার করে সারা বাস শুনিয়ে ঘোঁতনদা'র বিয়ের দিন কি কাণ্ড হলো সেই গল্প শুরু করলেন। বাস সি. আই. টি. রোড ছেড়ে বাঁ দিকে বেঁকল।

বণ্ডেল রোড, চার নম্বর গেট, এই সব নামগুলো কেমন যেন অচেনা। এতকাল কলকাতা শহরে আছি অথচ চার নম্বর গেটের পাশে থাকি—একথা কারুকে বলতে শুনিনি। অথচ কণ্ডাকটর চার নম্বর গেট, চার নম্বর গেট বলে চেঁচাচ্ছেন—অমনি একদল লোক হুড়হুড় করে নেমে যাচ্ছে, একদল লোক উঠছে। এখানেও তো কম লোক থাকে না। আমার ইচ্ছে হলো, একদিন পায়ে হেঁটে এ রাস্তা দিয়ে ঘুরব। এখানে রাস্তাটা খুব ছোট, দুটো বাস পাশাপাশি এলে সরু হয়ে কাৎ হয়ে যেতে হয়। উগ্র কাঁচা চামড়ার গন্ধ। পাশে রেল লাইন। ছোট ছোট খাপরার ঘরে গরু ছাগল আর মানুষ এক সঙ্গে রয়েছে। রাস্তায় কয়েকটি উলঙ্গ ছেলে। বড়ো শহরের এই রকমই বৈশিষ্ট্য। 'বড়ো'র পীরিতি বালির বাঁধ, খনে হাতে দড়ি খনেক চাঁদ।' এই মাত্র ছিল সি. আই. টি. রোডের চমৎকার রাস্তা, সাজানো বাড়িঘর—মাঝখানে চামড়ার হঠাৎ গন্ধ আর বস্তি আর আবর্জনা—আবাব একটু পরেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে মর্ত্যের স্বর্গ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে বাস হাজরা রোডে পড়ল।

এখানে হঠাৎ বাস প্রায় খালি। মনে হয় বাসে চড়ার মানুষ এসব রাস্তায়

খুব কম থাকে। এখন দোতলা বাসের জানালার ধারে ধারে একজন একজন বসে আছে। পাশের সীটগুলো প্রায় ফাঁকা। আমার পাশের লোকটিও কখন যেন নেমে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ উগ্র সেন্টের গন্ধ নাকে লাগল।

'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন'?

চমকে উঠলুম। কণ্ডাকটর নয়, একটি তরুণী, হালকা নীল রঙা লাইলন জর্জেট পরা, কানে দুটি মুক্তোর দুল। মেয়েটিকে সুন্দরীই বলতে পারতুম, কিন্তু ঐ বিশ্রী সেন্টের গন্ধ সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছিল। মেয়েটির পিছনে বাচ্চা ছেলে কোলে নিয়ে একটি পুরুষ, পুরুষটিকে দেখলেই বোঝা যায়—কোনো এক গোধূলি লগ্নে তিনি তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। ব্যাপারটা বোঝা গেল, বাসের প্রায় সব কটা আসনই একটা একটা খালি, ওরাঁ পাশাপাশি বসতে চান। মেয়েটি ব্যগ্র গলায় আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন?'

আমি মেয়েদের অন্ধ স্তাবক। কিন্তু এটুকু জানি, মেয়েদের আর যত গুণই থাক—সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ মেয়েরই ভদ্রতাবোধ তেমন প্রবল নয়। ট্রামে-বাসে হিলতোলা জুতোয় পুরুষদের পা মাড়িয়ে দিয়ে মেয়েরা অক্লেশে ভ্রূক্ষেপহীন থাকে, লেডিস সীটে বসে থাকা পুরুষদের তুলে দিয়ে তাদের প্রতি একটু সামান্য কৃতজ্ঞতার হাসি বিলোতেও তারা কার্পণ্য করে, এই ধরনের স্বার্থপর অনুরোধও তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। এই জন্যই পুরুষটি সলজ্জ মুখে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যাই হোক, মেয়েদের দেখে তড়াক করে আসন ছেড়ে দিতে আমার বেশ ভালোই লাগে, তাতে মনের মধ্যে এক ধরনেব সুড়সুড়ি বোধ করি। কিন্তু এক্ষেত্রে, ঐ বিশ্রী সেন্টেব গন্ধেব জন্য মেয়েটিকে আমি গোড়া থেকেই অপছন্দ করেছিলুম। আমি বিলিতি-প্রেমিক নই, কিন্তু দিশী সেন্টের গন্ধের চেয়ে ঘামের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ, কাঁচা চামড়ার গন্ধ, পেট্রোল পোড়ার গন্ধ এসব স্বাভাবিক গন্ধও আমার অনেক ভালো লাগে। কিন্তু মেয়েটির অনুরোধ তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সেইজন্য শীতকালের পুকুরে স্নান করতে নামার সময় যে রকম আলস্য লাগে—সেই রকম ভঙ্গিতে আমি চটিতে পা গলাতে গলাতে বললুম, উঠতে হবে? আচ্ছা—

মেয়েটি বোধহয় আমার ভঙ্গি দেখে অপমানিত বোধ করল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে মেয়েটি সামনের সীটের আরেকজন পুরুষের পাশে বসে পড়ে স্বামীকে বলল, তুমি ওখানেই বসো—একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।...পুরুষটি লাজুক মুখে আমার পাশে বসলেন। আমি হাসি চেপে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলুম। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

একটু পরেই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, ঐ তো ট্যাক্সি যাচ্ছে, ডাকোনা ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

রাস্তা দিয়ে আলো জ্বালিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, পুরুষ ও নারীটি বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সমস্বরে চেঁচাতে লাগল সেটার উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সিটা হঠাৎ থেমে পড়ল এবং দোতলা বাস তার পিছনে একটা ঢুঁ মারল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল জগৎ সংসার, ঝন ঝন—আমার কপাল ঠুকে গেল সামনের সীটে, মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়, বাসসুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাকসিডেনট! অ্যাকসিডেনট!

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ভিড়, দুপদাপ করে আমরা সবাই বাস থেকে নেমে পড়লুম। সেই মেয়েটির হাত ধরে পুরুষটি পিছন দিকে দ্রুত পালাল। আমার ভ্রমণ পর্বেরও সেইখানেই শেষ।

ভ্রমণের অশেষ উপকারিতা। সেদিন আমি ভ্রমণ করব এই মনস্থ করাতেই শেষ পর্যন্ত আমার বাসের ভাড়া লাগেনি।

১৬

ভেবেছিলুম এড়িয়ে যাব, ফুটপাত বদল করব। কিন্তু তিনিই তাঁর কোঁচকানো ভুরুর নীচের নিষ্প্রভ চোখ দুটি দিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন, বললেন, কী রে, তুই অমুক না? দাঁড়া, মনে করে দেখি, নাইনটিন ফিফটির ব্যাচ। কী, ঠিক বলেছি?

পা দুটো জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রণাম করতে হবে। আমি বালকের মতন মুখভঙ্গি করে বললুম, হ্যাঁ স্যার। তারপর, যেন মাটিতে পয়সা পড়ে গেছে, কুড়োচ্ছি—সেরকম ভাবে কোনোরকমে ঝুপ করে নিচু হয়ে কোনক্রমে পা দুটো একটু ছুঁয়েই আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ভালো আছেন, স্যার?

এরপরের ঘটনা অত্যন্ত একঘেয়ে এবং অতি সাধারণ হতে পারত। পুরোনো ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের পথে দেখা হওয়া এরকম আকছার অনেকের হচ্ছে। কথাও বাঁধাধরা, মাস্টারমশাই ছাত্রটির নাম মনে করার চেষ্টা করবেন—অঙ্ক কিংবা সংস্কৃত শিক্ষক হলে নামটা মনে করেও ফেলবেন ঠিক, তারপর প্রণাম, ঘাড় চুলকানো, কোথায় থাকিস: কী কাজ করিস, ছাত্রটি চেষ্টা করবে কতক্ষণে কেটে পড়া যায়, মাস্টারমশাই চেষ্টা করবেন, ছাত্রটি যদি বড়ো চাকরি বা ব্যবসা করে তবে তার ওখানে তাঁর নিজের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে বা ভাইপোকে ঢোকানো যায় কিনা, আজকালকার ছাত্ররা কত খারাপ হয়ে গেছে—আগেকার ছাত্ররা কত ভালো ছিল, এই আলোচনা ইত্যাদি। কিন্তু আমি একটু ইয়ার্কি করার চেষ্টার ফলে সব ব্যাপারটা বদলে গেল।

গল্প-উপন্যাসে শিক্ষকদের খুব মহৎ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়। আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গোটা ছাত্রজীবনে আমি কোনো মহৎ শিক্ষকের দেখা পাইনি। এমনি কোনো অধ্যাপক বা শিক্ষকের কাছ থেকে এমন একটি কথাও আমি শুনিনি যা আমার জীবনে দাগ কেটেছে বা আমার জীবনের পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করেছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আমি যতখানি শ্রদ্ধা করি, কোনো শিক্ষককে তার চেয়ে একচুলও বেশি শ্রদ্ধা করি না। পুরোনো শিক্ষকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করা নিয়ম, অথচ বন্ধুর বাবার সঙ্গে দেখা হলে তো তা করতে হয় না সুতরাং ওটা আমার পছন্দ নয়। আমি সাধারণত শিক্ষকদের দেখলে না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। নেহাৎ মুখোমুখি পড়লে উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন একটা প্রণাম এবং দু-চারটে মামুলি কথা বলতেই হয় ভদ্রতাবশত।

চৌধুরী স্যার আমাদের অঙ্কের ক্লাশ নিতেন। আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখনই তিনি বুড়ো, এই আঠারো বছরে তিনি আর একটু বুড়ো হয়েছেন এবং রিটায়ার করেছেন। বিষম রাগী ছিলেন, কথায় কথায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাতেন, কনফাইন করতেন, খুব গালাগাল দিতেন, ওর প্রিয় গালাগাল ছিল, চেহারা দেখলেই বোঝা যায় 'গোমুখ্যর বংশে জন্ম!' চৌধুরী স্যারের উপর খুব রাগ ছিল আমাদের—এখনকার ছেলেরা শিক্ষকদের ছুরি দেখায়, বোমা মারে—আমরা অতটা করতুম না বটে, কিন্তু ক্লাশে বেড়াল ডাকা কিংবা গণেশ চৌধুরীকে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলা, গনশা, কী রে গনশা, কলা খাবি?—এসব খুব চলত।

সুতরাং সেই চৌধুরী স্যারকে দেখে আমার খুব খুশি হওয়ার কথা নয়, পুরোনো কথা মনে পড়ল। আমি একটু ইয়ার্কি করার লোভ সামলাতে পারলুম না। নানা কথার পর উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই কতদূর লেখাপড়া করেছিলি? এম. এ. পাশ করেছিলি তো?

—আমি বললুম, না স্যার।

—এম. এ. পাশ করিসনি? তোর বাবা পড়াল না? তাহলে বি. এ. পাশ করেই।

—না. স্যার, বি. এ. পাশও করতে পারিনি।

—বি. এ. পাশ করিসনি?

—না। আই. এস-সি.-তে পর পর দুই বছর গাড্ডু খেলুম, তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দিলুম।

—আই. এস-সি. ফেল করেছিলি, তুই তো লেখাপড়ায়...কলেজে গিয়ে...শেষ পর্যন্ত ফেল করলি?

—হ্যাঁ স্যার, অঙ্কতেই পর পর দুই বছর গাড্ডু মেরে আর ধৈর্য রইল না, ছেড়ে দিলুম পড়াশুনো।

—অঙ্কে ফেল করলি? আই. এস-সি.-তে...সোজা অঙ্ক...ফেল করলি?

মাস্টারমশাইর মুখখানা বদলে গেল, ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ, ছানি পড়া চোখ দুটো ভিজে ভিজে, এগিয়ে এসে আমার হাতখানা চেপে ধরে কাতর আর্তনাদ করে বললেন, অঙ্কে ফেল। অঙ্কেই—

তখন তো আর অন্য কিছু বলা যায় না আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মাস্টারমশাই বললেন, তুই বাবা একটু আমার সঙ্গে যাবি? তোর সঙ্গে দুটো কথা বলব—কাছেই আমার বাড়ি, আয় না, দশ মিনিট!

এমনভাবে বললেন, যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাছাড়া আমার সঙ্গে কী কথা বলবেন তা শোনারও কৌতূহল ছিল। সঙ্গে গেলুম। কাছেই গলির মধ্যে বাড়ি, একতলার অন্ধকার ঘর, পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খোলার চেষ্টা করলেন, হাত কাঁপছে ওঁর—তালা খুলছে না, আমি সাহায্য করতে এলুম। উনি বললেন, ছেলেটা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। একাই থাকি।

ঘর ভর্তি ছেঁড়া বই, তক্তাপোষে বিছানা গোটানো, দুটো চেয়ারও ছিল. আমাকে খাতির করে বললেন, বোস বাবা, ঐ চেয়ারটাতে বোস! মাস্টারমশাইকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল, নিজে ঝিম মেরে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তাঁর মন যেন শরীর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। দুজনেই চুপচাপ, একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। পরিবেশ সহজ করার জন্য আমিই কথা তুললুম, স্যার আপনি তো আর এখন ঐ ইস্কুলে নেই।

—না, দু-বছর আগে রিটায়ার করেছি। এক বছর এক্সটেনশানও দিয়েছিল...

—এখন কি তাহলে অন্য কোথাও...

—না রে বাবা, দুটো টিউশনি করি—প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হাজার সাতেক টাকা পেয়েছি, নিজেরও জমোছিল তিনচার হাজার—আর যে-কটা দিন বাঁচব—ভালোই চলে যাবে। ছেলেও দেয় কিছু মাঝে মাঝে—একেবারে বাপকে ফেলেনি, শুধু ওর বউ—এর সঙ্গে আমার বনে না।

—তাহলে স্যার সারা জীবন তো পরিশ্রম করলেন, এখন একটু দেশ ভ্রমণ-ট্রমণ, মানে কোথাও গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম—

—হ্যাঁ কাশীতে গিয়েছিলাম গত বছর, কিন্তু অন্য কোথাও মন টেঁকে না—

আবার হঠাৎ থেমে গেলেন, সোজাসুজি তাকালেন আমার দিকে, অসহায় বৃদ্ধের স্তিমিত ছলছলে চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ভাঙা-ভাঙা গলায়

বললেন, তোকে যে কথাটা বলব বলে ডেকে এনেছি, তোর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি বাবা, তুই আমায় ক্ষমা কর।

—সে কি?

—আমি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে বলছি যে আমাকে তোরা ক্ষমা করিস, আমি অনেক দোষ করেছি, মহাপাপ করেছি—

আমি চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। বৃদ্ধের চোখে স্পষ্ট জলধারা। আমি বললুম, না না, স্যার, একি বলছেন আপনি, আমরাই কত দোষ করেছি—

— না রে, ওসব না। আজ জীবনের শেষ সীমায় এসেছি, দু-চারদিন পরেই সব ছেড়ে যেতে হবে—আজ সব কথা মনে পড়লে বড়ো অনুতাপ হয়। ছেলেদের শিক্ষার ভার নিয়ে কত ফাঁকি দিয়েছি, ক্লাশে ঘুমিয়েছি কতদিন, প্রাইভেট টিউশনি করার ঝোঁকে ক্লাশে পড়ানো ফাঁকি দিয়েছি, বড়োলোকের ছেলেদের বেশি শাস্তি দিতুম যাতে তারা আমাকে প্রাইভেট টিউটর রাখে, সত্যিকারের বিদ্যাদানের বদলে শুধু চমকধামক দিয়ে—ওরে মহাপাপ, এসব মহাপাপ করেছি আমি—

—না স্যার, আমরাই অমনযোগী ছিলুম, ক্লাশে গণ্ডগোল করতুম—

—ছেলেরা তো দুষ্টু হবেই, কিন্তু সত্যিকারের বিদ্যা অর্জনের আনন্দ যদি তাদের চিনিয়ে দেওয়া যেত, তা দিইনি ফাঁকি দিয়েছি—কত হাজার হাজার ছেলের জীবন অন্য রকম হতে পারত—

মাস্টারমশাই ময়লা রুমাল বার করে চোখের জল মুছলেন। এখন আর কান্না লুকোনোর কোনো চেষ্টাই নেই। জীবনের অস্ত-গোধূলিতে এসে বৃদ্ধের স্বেচ্ছা-অনুতাপ। এখানে কিছু বলাও যায় না। অন্যের চোখের জল দেখলে আমারও চোখে জল আসতে চায়- এই আমার এক বিশ্রী চোখের অসুখ, সুতরাং আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলুম। মাস্টারমশাই আবার বললেন, আমার ছেলেটা কলেজে পড়ায়, ওকে আমি বলি, আর সব কাজে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু মাস্টারিতে ফাঁকি দেওয়া মহাপাপ। কিন্তু সেও দেখি ঠিক মতন ক্লাশে যায় না, নোট লেখার জন্য ব্যস্ত, বাড়িতে কোচিং পড়াবার বদলে থিয়েটার কালচার বক্তৃতা দেয়- আমার কথা শুনবে কেন? আমারও বলার মুখ নেই আমি নিজেই—

—স্যার, আমি তাহলে আজ যাই?

—যাবি? যদি পারিস ক্ষমা করিস—আর কটা দিনই বা বাঁচব—এখন মনে হয় জীবনটা যদি আবার গোড়া থেকে শুরু করা যেত—তাহলে এবার একটুও ফাঁকি দিতাম না, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে—

—আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় স্যার আবার যদি ছাত্রজীবনটা গোড়া থেকে

শুরু করা যেত—তাহলে এবার সত্যিই মন দিয়ে পড়াশুনা করতুম। মাস্টার-মশাইদের অসম্মান করতুম না, জ্ঞানের মর্ম এখন বুঝতে পেরেছি—কিন্তু এসব কথা বড্ড দেরিতে মনে পড়ে—

আসবার সময় মাস্টারমশাইকে আমি আবার প্রণাম করলুম। এবার সত্যিকারের আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে।

১৭

হ্যালো? জয়ন্তী আছে? কে জয়ন্তী? আজ দুপুরে কি করলুম জানিস? গেস হোয়াট?

—কী?

—ওকি, তোর গলা ওরকম কেন? ঘুমোচ্ছিলি?

—না-না। দুপুরে কি করলি বল না!

—দাড়া এক সেকেণ্ড। মা ঘরে এসেছে, চুপ, শোন তোর হিস্ট্রির নোটগুলো আমায় একটু দেখতে দিবি—?

—হি-হি-হি, ন্যাকা। দুপুরে কি করলি বল না।

—জানিস ভাই, আমার স্মিথের বইটা খুজে পাচ্ছি না...

—এই শর্মিষ্ঠা চুপ করে রইলি কেন?

—চুপ, আচ্ছা, মা চলে গেছেন। জানিস আজ দুপুরে সোবার্সকে ট্রাঙ্ককল করেছিলুম।

—সোবার্স? রিয়েলি? পেয়েছিলি?

—হ্যাঁ—। এমন মজা, হা-হা-হা।

—কী বলল? কী বলল?

—ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যালো, হ্যালো, জয়ন্তী শুনতে পাচ্ছিস, সোবার্স আমাকে জিজ্ঞেস করল আপনি কে? আমি বললুম, সেই যে ক্যালকাটা টেস্টের ফিফথ ডে-তে একটি মেয়ে প্যাভেলিয়ানে আপনার কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিয়েছিল... মেরুন রঙা সিল্কের শাড়ি, হলদে কাশ্মিরী স্টোল, সাদা রঙের ঘড়ির ব্যাণ্ড—সেই মেয়েটিকে—

—হি-হি-হি—চিনতে পারল? যাঃ, আঃ, লাইনটায় এত ডিসটার্বেন্স হচ্ছে, চিনতে পারল?

—হ্যাঁ, ও বলল, ঠিক চিনতে পারছি। আমি জিজ্ঞেস করলুম, হা-হা-হা, তুমি

অঞ্জুকে কি দেখে পছন্দ করলে? বাঙালি মেয়ে তোমার পছন্দ হলো না?

—কী বলল? কী বলল? হ্যালো? আঃ, লাইনটায় এমন।

—কী বলল জানিস? হা-হা-হা...ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি হতে রাজি হয়েছে, মিঃ দাশগুপ্ত, আপনি তা হলে—হ্যালো, এ আবার কে? হ্যালো জয়ন্তী?

—হ্যাঁ, বল, মাঝখানে অন্য কে-যেন কথা বলছে, তারপর সোবার্স কি বলল?

—সত্যি, ওর খুব সেন্স অব হিউমার আছে। সত্যিকারের পারফেক্ট অল রাউণ্ডার।

—কী বলল বল না? অঞ্জুর নাম শোনার পর।

—বলল,...হা-হা-হা, আই মে ইয়েট চেঞ্জ মাই মাইণ্ড। বুঝলি?

—তোমরা এখন একটু লাইন ছেড়ে দেবে? ক্রস কানেকশন হয়ে গেছে।

—কে? ক্রশ কানেকশন হয়েছে তো আপনি লাইন ছেড়ে দিন! আমরা জরুরি কথা বলছি।

—আমারটাই বেশি জরুরি। তোমরা লাইন ছেড়ে দাও।

—আপনি তুমি বলে কথা বলছেন কেন? ভদ্রতাও জানেন না।

—শোন খুকুমনি, আমার ট্রাঙ্ককল, আমি দেরি করতে পারছি না, তোমাদের অনুরোধ করছি।

—আবার খুকুমণি বলছেন? অভদ্র কোথাকার।

—আমি সত্যি অভদ্র নই, কিন্তু এত বিশেষ দরকার—দয়া করে শোনো।

—আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না।

—আমিও ঠিক তাই। এখন তোমার বদলে মিঃ দাশগুপ্তার গলা শোনাই আমার পক্ষে বেশি জরুরি। পরে অবশ্য তোমার সঙ্গে কথা বলে ধন্য হতে পারি—

—দূর ছাই।

ক্রি-রি-রি-রিং। হ্যালো? কে জয়ন্তী? এমন অভদ্র লোকের পাল্লায় পড়ে লাইনটা কেটে দিতে হলো—

—আমি জয়ন্তী নই, আমি গারফিল্ড সোবার্স কথা বলছি।

—আবার? চারিদিকে খালি অসভ্য লোক। আপনি কে?

—বললুম তো, সোবার্স। চিনতে পারছেন না?

—ইনক্রেডিবল। সোবার্স বাংলা জানেন না।

—কলকাতায় এসে থাকব বলেই তো একদিনে তাড়াতাড়ি বাংলা শিখে নিলাম।

—মোটেই না, আপনি একটি অসভ্য চ্যাংড়া। এখানে কিছু সুবিধে হবে না। আপনি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন?

—কি করব? টেলিফোন তুলেই যদি মেয়েদের গলা শোনা যায়, তাহলে না শুনে পারি?

—সত্যি করে বলুন, আপনি কে? আপনার নাম কি?

—সত্যি বলব? আমার নাম যযাতি।

—যযাতি, যযাতি কি?

—শুধুই যযাতি। শর্মিষ্ঠা, তুমি আমায় চিনতে পারছ না? আমি সেই অনন্ত যৌবন যযাতি, তোমার জন্য।

—আবাব অসভ্যতা? আপনার লজ্জা করে না?

—লজ্জা কবা উচিত তো তোমার। যযাতির বদলে তুমি সোবার্সকে—

—দূর ছাই।

ক্রি-রি-রি-রিং। হ্যালো? আপনি কে বলছেন, আগে নাম বলুন।

—ওকি রে শর্মিষ্ঠা, তোর কি হলো? আমি জয়ন্তী বলছি।

—জয়ন্তী? বাবাঃ, বাঁচলুম। এমন সব বাজে লোকেরা টেলিফোন করে বিরক্ত করে না। এই মাত্র একটা লোক টেলিফোন করে যা-তা বলছিল—

—কি বলছিল রে?

—ঐ, যা সব ছেলেরাই বলে, আমাকে ভালোবাসে, আমাকে না দেখলে বাঁচবে না।

—হি-হি-হি, তোর এত অ্যাডমায়ারার, কি করবি বল। নাম বলেনি? রণবীর নয় তো?

—কে জানে! একবার বলছিল সোবার্স, একবার যযাতি—কি করে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পায় বলত? ভূতুড়ে ব্যাপার—আমাব নামই বা জানল কি করে?

—তা হলে বোধহয় প্রদ্যোৎ ব্যানার্জি। ও তো সব সময়ই তোকে টেলিফোন করার চেষ্টা করে।

—দু চক্ষে দেখতে পারি না ছেলেটাকে। এমন ন্যাকা—

—জানিস, কাল আমাকেও দু'জন টেলিফোন করেছিল, বিকাশ আর ধনঞ্জয়—

—ধনঞ্জয়? ওর সঙ্গে তোর তো ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ। জন্মেও ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। তবু টেলিফোন করে বিরক্ত করবে, কাল দুপুরে একটু পড়তে বসেছি—

—হি-হি-হি, তুই এখনো দুপুরে পড়তে বসিস।

—কি করব, অভ্যেস তো রাখতে হবে। ১০৮ দিন কলেজ বন্ধ।

—সত্যি ভাই, দুপুরগুলো যে কি করে কাটাই। ধনঞ্জয় কি বলল?

—তোর তো খুব ধনঞ্জয় সম্পর্কে উৎসাহ দেখছি। কি রে, ভেতরে ভেতরে—

—আমার বয়ে গেছে। ওসব কবি-টবি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

—তোর লেটেস্ট এখন কে রে? বিমান?

—বিমান তো দিল্লি চলে গেছে। বোধহয় ওখানকার কলেজেই ট্রান্সফার নেবে।

—আহা, তাই তোর এত মন খারাপ, হি-হি-হি।

—মন খারাপ আবার কোথায় দেখলি? তুই হেনরি মিলারের সেই বইটা ফেরৎ পেয়েছিস? আমায় দে-না।

—ওটা সুমিতা নিয়েছে, দুবার পড়েছে। তুই লুকিয়ে রাখতে পারবি তো বাড়িতে? বড়োরা কেউ দেখলে, ইট মাইট...বুঝলি তো একটা আননেসেসারি গণ্ডগোল—অবশ্য সবাই পড়তে চায়, লাবণ্যর ছোট কাকা, বুঝলি হি-হি-হি, সেই যেন সেন্ট্রালের সেক্রেটারি, খুব মরালিস্ট, হাতে বইখানা দেখে কেড়ে নিলেন, তারপর দেখা গেল তিনি নিজেই গোপনে বিভোর হয়ে পড়েছেন হি-হি-হি।

—হিপক্রিট। তুই আমাকে কবে দিচ্ছিস? আমার বাড়িতে একটাও বই নেই, সব বই—

—কি, চুরি গেছে?

—না-না, বলছি, না-পড়া গল্পের বই একটাও নেই, আচ্ছা শোন—

—দাঁড়া এক মিনিট, কে যেন বাইরে ডাকছে। লাইনটা ধরে থাকিস,—ছাড়িস না।

—নিঝুম সন্ধ্যায়, ক্লান্ত পাখি গায়...তুম সে মোহাবৎ হো গেয়ি হ্যায় মুঝে পালকো কি ছাঁউ...

—কি রে, গান শুরু করেছিস। এই শর্মিষ্ঠা শোন, প্রদীপ্তদা এসেছেন।

—তা হলে আমি রেখে দিচ্ছি। তোমরা এখন নিভৃতে কুজন শুরু করো।

—না-না, শোন প্রদীপ্তদা সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তুই যাবি?

—তোমাদের সঙ্গে আমি গিয়ে কেন ভিড় বাড়াব বাবা? শেষে আমায় অভিশাপ দেবে—। টু ইজ কমপানি, থ্রি ইজ ক্রাউড।

—যাঃ। চল্ না, প্রথমেই একটা সিনেমায় যেতে রাজি হয়ে গেলে ছেলেরা বড্ড লাইসেন্স পেয়ে যায়। হি-হি-হি— জানিস তো কী রকম হ্যাংলা সব—

—আমি তোকে শীল্ড করতে যাব? মোটেই না—

—এই এই শোন, প্রদীপ্তদা তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন—হ্যালো শর্মিষ্ঠা,

চলো না, একটা সিনেমা দেখে আসি?

—কী ব্যাপার, ফাস্টক্লাশ ফাস্ট হওয়ার ক্যাণ্ডিডেটের পড়াশুনো ছেড়ে এত সিনেমা দেখার জন্য ব্যস্ততা?

—পড়াশুনো? তিন মাস বই ছুঁয়েছি নাকি? প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেটদের মতন দুপুরবেলা বাড়িতে বই মুখে নিয়ে বসে থাকব? চলো, চলো।

—কী বই দেখব? হিন্দী ইংরেজি একটাও তো বাকি নেই। আজকাল এক-একটা বই এত বেশি দিন চলে—

—সব দেখা হয়ে গেছে? তা হলে চলো বাংলা।

—বাংলা? ঐ একঘেয়ে প্যানপ্যানানি? না, আপনারা দুজনেই যান।

—না, তুমিও চলো, তুমি না গেলে ভালো লাগবে না।

—ইস। আমার জন্য যেন কত ব্যাকুল আপনি। আর ভদ্রতা করতে হবে না।

—তুমি জানো না, আমি মনে মনে কতখানি...একটু দেখা পাবার জন্য, একটু কথা—

—থাক, থাক, ওদিকে আবার শুনে ফেলবে। তা হলে দুকলই হারাবেন।

এই রকম সংলাপ আরো বহুক্ষণ চলবে। একটি কলেজের এবা তিনজন স্কলারশীপ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী।

১৮

কী থেকে শুরু হয়েছিল জানি না, আমি যখন মাঝপথে বাসে উঠেছি, তখন পাশাপাশি দুটি সীটে তুমুল ঝগড়া চলছে। দু'পক্ষই প্রায় মধ্যবয়স্ক বাঙালি। মূল যোদ্ধা দুজন, কিন্তু বিয়েব দিন বরেব সঙ্গে যেমন নিতবর থাকে ডুয়েলে থাকে সেকেণ্ডম্যান, তেমনি ট্রাম-বাসের ঝগড়াতেও উভয় পক্ষেই একজন অন্তত সঙ্গী থাকে। এখানেও তাই। এপাশে দুজন, ওপাশে দুজন। এপাশেও একজন ধুতি, একজন প্যান্ট, ওপাশেও তাই।

ঝগড়ার ডিগ্রিও আছে। প্রথমে একটু একটু গলা চড়বে। তারপর মুখ খারাপ। তারপর হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াতে পাবে। আমি যখন প্রত্যক্ষদর্শী হলুম, তখন "ভদ্রলোকের মতন জামাকাপড় পরলেই ভদ্দরলোক হয় না,...ইতরের মতন কথা বলবেন না" "অত গরম দেখাচ্ছেন কি, কেন মারবেন নাকি? ঢের ঢের মারনেওয়ালা দেখেছি"—এই ধরনের শ্রবণ-সুখকর বাক্যবলী বর্ষিত হচ্ছে।

এপাশের নিতবরটি বলছে, "ছেড়ে দে সুখেন, বাজে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে শুধু শুধু এনার্জি নষ্ট করে কি হবে।" ওপাশের নিতবর: "মুখ সামলে কথা বলুন। কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন।"

বাস ময়দানের গা ঘেঁষে ছুটছে। আগুনের হল্কা মাখানো বাতাস। মেজাজ সকলেরই গরম, একটুতেই ঝগড়া তুমুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। ঝগড়ায় জড়িয়ে না পড়ে ঝগড়া শুনতে এবং দেখতে আরো ভালো লাগে। আমি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলুম।

হঠাৎ নাটকীয়ভাবে সব কিছু বদলে গেল। হাতাহাতির ঠিক আগের মুহূর্তে সংলাপ এই ধরনের চলছিল, "ঠিক আছে, বাস পাড়ায় আসুক, টেনে নামাব। দেখাচ্ছি আজ, কত ধানে কত চাল। কালীঘাটের লোকেদের এখনো চেনোনি।" অন্যপক্ষ: "আমরাও গরচার লোক—গরচার লোকের গায়ে হাত দিয়ে কলকাতা শহরে কেউ এ পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়নি। ভারী কালীঘাট দেখাচ্ছে।"

—গরচা দেখাবেন না। গরচা আমাদের ঢের চেনা আছে।

—চেনা থাকলে, গরচার লোকের সামনে কেউ বুক বাজিয়ে কথা বলে না। টেংরি খুলে নেব।

—ঢেব ঢের টেংরি খুলে লেনেওয়ালা দেখেছি। গরচার জগুদা আমার দাদাব শালা—তার কথায় পাড়ায় ছেলেরা ওঠে বসে।

অপরপক্ষে এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। তারপর ঈষৎ কম জোরালো গলায়, কোন জগুদা? জগদীন্দ্র সরকার?

—হ্যাঁ, পুলিশে কাজ করেন। ছ' ফুট তিন ইঞ্চি হাইট।

—মোড়ের মাথায় সাদা বাড়ি যার?

—তিনতলা বাড়ি। নীচতলায় রেডিওর দোকান—

—সে কি মশাই। উনি যে আমার মেসোমশাই। উনি আবার আপনার দাদার শালা হলেন কি করে?

—আলবাৎ। আমার দাদার নাম নীতাশ মজুমদার। জগুদার আপন বোনেব সঙ্গে...

মিনিট দু-একের মধ্যে সব ঝগড়া মিটে গেল। দূর সম্পর্কের হলেও দুই পক্ষই দুইপক্ষের আত্মীয়। নিছক আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এ ধরনের তিক্ত ঝগড়া করার জন্য ওরা খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। মাপ করবেন দাদা। কিছু মনে করবেন না।

—না-না, ওরকম হয়েই থাকে। মানে মেজাজ কখন কার কি রকম থাকে, বুঝলেন না, ছি-ছি, কত খারাপ কথা বলেছি।

—ভুলে যান্ ভুলে যান্। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। আজই আসুন না।

—না, না আজ নয়। আর একদিন যাব, নিশ্চয় যাব। এই তো আলাপ হয়ে গেল এখন—

—বাড়িতে গিয়ে বলব বৌদিকে। আপনারা নামটা কি বললেন?

আমি ততক্ষণে একটা বসবার আসন পেয়েছি। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলুম, ওঁরা তাহলে এত ঝগড়া করছিলেন কি জন্য। এরকম তুমুল ঝগড়া—আর একটু হলে হাতাহাতি, রক্তপাত এমনকি খুনোখুনিও হতে পারত। কিন্তু এত সহজে থেমে গেল যখন, তখন ঝগড়াটা কি না হলেও চলত? এই খুনোখুনির ঝগড়া কি একটা নিছক খেলা। একজন জগুদার নামেই মন্ত্রের মতন কাজ হলো। জগুদা—একজনের দাদার শালা, অন্য জনের মেসোমশাই। তাহলে সম্পর্কটা কি দাঁড়াল? দাদার শালার ভায়রাভাইয়ের ছেলে। এর চেয়ে ওরা দুজনেই যে একই দেশের লোক—এটা কি আরো নিকট সম্পর্ক নয়? এটা কি ঝগড়া না-করার কারণ হতে পারে না?

এরকম ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ে ট্রামে বাসে। সবচেয়ে কুৎসিত হাস্যরসের অবতারণা হয় পাশাপাশি দুটি লেডিজ সীটেই পুরুষ যাত্রী বসে থাকলে। কোনো মহিলা উঠলেন, দু সীটের দু পেয়ার যাত্রীই তখন "মানিকতলার রাস্তা দেখায় রত।" ধারের সীটের দুজন পাশের লোকের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে খুব মনোযাগ দিয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখবে। কাছাকাছি মহিলা এলে পুরুষ মাত্রই তার দিকে একবার চেয়ে দেখবে—এইটাই প্রাকৃতিক এবং জৈব নিয়ম। এই সব নিয়ম উল্টে যায়—যখন কোনো পুরুষ লেডিজ সীটে বসে থাকে। তখন সেই পুরুষের কাছে পৃথিবীর যে-কোনো দৃশ্যই আকর্ষণীয়—একমাত্র নারীর রূপ ছাড়া।

সেই রকমই একদিন পাশাপাশি দুটি সীটেই চারজন পুরুষ বসে, বাচ্চা কোলে করে এক মহিলা উঠলেন। যা হয়, কেউই সীট ছাড়লেন না, এক পেয়ার ভাবলেন অন্যরা ছাড়বে, অন্যরাও তথৈবচ। মহিলাটি যে সীটের কাছাকাছি—সেই সীটের দুজনের একজন তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লেন, বাকি জন জানলার বাইরে মুখ রেখে অনবরত থুতু ফেলে যেতে লাগলেন। বাস ভিড়ে থৈ থৈ করছে, কণ্ডাক্টর ঝুলছে বাইরে—গাছে লটকানো ঘুড়ির মতন—তার ওসব দেখার সময় নেই। তখন পাশের লেডিস সীটের এক ভদ্রলোক বললেন এদিকে চেয়ে, ও মশাই, আপনাদের সীটটা ছেড়ে দিন না।

যে ভদ্দরলোক জানলা দিয়ে থুতু ফেলায় ব্যস্ত, তিনি বারেক মুখ তুলে বললেন, এটা লেডিজ সীট নয়। আমি দেখেই বসেছি।

—লেডিজ সীট নয় মানে?

—তাকিয়ে দেখুন না।

—নিশ্চয়ই লেডিজ সীট।

—চোখ থাকে তো ভালো করে দেখুন।

বাসের কোনো লোকের আর কোনো কাজ নেই। সবাই ঝুঁকে সেই সীটের চারপাশে দেখলেন। স্টেট বাসের কোন কোন্ আসন মেয়েদের—তা সকলেরই মুখস্ত। দোতলা বাসে দুদিকে দুখানা লম্বা সীট, তার পাশে দুখানা করে। বাকিগুলো সব ভর্তি, শুধু দুপাশের দুটিতে এখন পুরুষ বসা।

দেখা গেল, জানলা দিয়ে থুতু-ফেলা লোকটির একটা যুক্তি আছে। বাসের দেয়ালে যেখানে 'লেডিজ সীট' লেবেল আঁটা থাকে, সেই লেবেলটি নেই, খুলে পড়ে গেছে, কে যেন সেখানে খড়ি দিয়ে কথাটা লিখে রেখেছিল— লেখাটাও অস্পষ্ট হয়ে প্রায় মুছে গেছে।

—লেখা না থাকলেই বা। সবাই জানে এটা লেডিজ সীট—

—মোটেই না। লেখা নেই কেন? তাহলে সবগুলোই কি লেডিজ সীট? সবই পাকিস্তান। মামদোবাজি—

এরপর কনভেনশান বনাম চাক্ষুষ প্রমাণ এই নিয়ে রীতিমত বচসা শুরু হয়ে গেল। খুব বেশি দূর গড়াল না, কারণ ছেলে কোলে মহিলাটি রাগতভাবে বললেন, আপনারা ঝগড়া করছেন কেন? আমার বসার দরকার নেই, আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তখন ওপাশের সীটের থেকে একজন, এতক্ষণ পরে শিভালরাস হয়ে কোনোক্রমে শরীরটা একটু উঁচু করে বললেন, আপনি এদিকে আসুন। আসুন।

মহিলা তবু বললেন, না, আমার দরকার নেই। আধবসা লোকটি ঝপ করে আবার নিজের জায়গায় ভালো করে বসলেন।

বলতে ভুলে গেছি, দুই সীটের চারজন ভদ্রলোকই পরিচ্ছন্ন পোশাকে ভূষিত, নিখুঁত দাড়ি কামানো, নির্ভুল মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি।

দু-এক স্টপ পরেই আর একজন মহিলা উঠলেন—প্রায় প্রৌঢ়া, কিন্তু সাজ-পোশাকে খুব আড়ম্বর, চালচলন বেশ সপ্রতিভ। ভিড় ঠেলে তিনি এদিকে চলে এসে নিজেই মেয়ে-কণ্ডাক্টর সুলভ গলায় বললেন, সীট। লেডিজ সীট।

সেই সীটের একজনের ঘুম তখনো ভাঙেনি বোঝা যায়, ডালহৌসি স্কোয়ার পৌঁছাবার আগে তাঁর কানের কাছে বোমা ফাটালেও ঘুম ভাঙবে না। জানলা-দিয়ে থুতু-ফেলা ভদ্রলোক তখনো থুতু ফেলে চলেছেন। একবার সামান্য মুখ তুলে চেয়েই তিনি আৎকে উঠলেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন, আরে মিলিদি, আসুন আসুন!

মিলিদি তার কি ধরনের দিদি হলো আমি জানতে পারিনি। কিন্তু কুৎসিত এই আত্ম-পর বোধ। থুতু-ফেলা ভদ্রলোক সীট ছেড়ে এবার আমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি এতক্ষণ চুপ করে দেখছিলাম। কিন্তু কিছু একটা করার জন্য ছটফটও করছিলুম অনবরত। আমার পায়ে ভারী বুট জুতো—তলায় দু-একটা পেরেক উঠেছে আমি জানি। একটু ধাক্কার সুযোগে ভদ্রলোকের পায়ে আমার জুতোটা তুলে খুব জোরে চেপে দিলুম। ভদ্রলোক আর্তনাদ করে উঠে আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। আমি কাচুমাচু মুখে বললুম, সরি। দেখতে পাইনি, মাপ করবেন।

পাঠক-পাঠিকারা হয়ত বলবেন, আমি ট্রাম-বাসের কথা নিয়ে বড়ো বেশি বার লিখছি। কিন্তু ট্রাম-বাসেই আমার সবচেয়ে দুঃখের সময় কাটে। সম্ভ্রান্ত, সভ্য চেহারার লোকদের নীচতা, স্বার্থপরতা, বাচ্চা ছেলের মতন বসার জায়গার প্রতি লোভ, মেয়েদের প্রতি সম্মানবোধের অভাব, নোংরামি—এসব গিসগিস করে কলকাতার ট্রামে-বাসে। আমার অনবরত মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ভাবি সামান্য পনেরো-কুড়ি মিনিটের যাত্রায় বসার জায়গা নিয়ে যারা নিজেদের মধ্যে এমন লড়াই করছে, তারা কি কোনোদিন বৃহৎ আদর্শের জন্য লড়াই করতে পারবে?

১৯

যেদিন সিগারেটের সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে যায়, মনের ভুলে চা খেয়ে ফেলি দশ কাপের বেশি—সেসব দিন বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে অনেকক্ষণ ঘুম আসে না, যত যাচ্ছেতাই বই-ই হোক পাতার পর পাতা উল্টে যেতেই হয়, তারপর —যখন মধ্যরাত ঝিমঝিম করে, আরশোলা কিংবা টিকটিকিরও নিশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়, দূরে অপস্রিয়মাণ কোনো গাড়ির আওয়াজ পর্যন্ত করুণ মনে হয়, তখন ইচ্ছে করে আলো নিবিয়ে দিই—তার পরই, অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে একটা হাল্কা জগতের মধ্যে ডুবে থাকি।

তখন ঘুমও নয়, জাগরণও নয়। সেই অবস্থাটাকেই তন্দ্রা কিংবা আবল্লী বলে হয়তো, কিংবা ঠিক তাও নয়, ডান পায়ের পাতাটা চাদরের বাইরে বেরিয়ে গেছে —একটু একটু ঠাণ্ডা লাগছে, ঠিক টের পাচ্ছি, কিন্তু পা-টা সরাতে ইচ্ছে করে না—মনে হয় একটু নড়লে চড়লেই কি যেন একটা ভেঙে যাবে। একটা অদ্ভুত নেশার মতন।

আমি স্বপ্ন খুবই কম দেখি, কিন্তু ঐ রকম আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে যখন আমার

শারীরিক জ্ঞান ঠিকই আছে, কিন্তু শরীরটা যেন হাল্কা, খুব হাল্কা, সেই সময় আমি প্রায়ই নানারকম শব্দ শুনতে পাই। হঠাৎ কোনো অদ্ভুত আওয়াজ কিংবা গলার স্বর। এ পৃথিবীতে আমি অনেক কিছু ভয় করি, অনেক মানুষকে ভয় করি, মেয়েদের তো প্রায় সকলকেই, খুব জোরে ছুটে যাওয়া ট্রাক দেখলে আমার ভয় করে, মাঠের মধ্যে মেঘ-গর্জন শুনলে আমার ভয়-ভয় করে, এমনকি, হাসপাতাল দেখলেই আমি ভয় পাই। কিন্তু বহুকাল আমার একা ঘরে শোওয়া অভ্যেস এবং বেশ কয়েক বছর আমি কবরখানার পাশের একটি বাড়িতে কাটিয়েছি বলে আমার ভূতের ভয়টা নেই। ভূত বিশ্বাস না-করার মধ্যে কোনো সাহসের পরিচয় নেই। বরং ওটা একটা করানো ব্যাপাব। ভূত কিংবা জন্মান্তর কিংবা স্বর্গনরক বিশ্বাস থাকলে বরং ভালোই হতো, তা হলে অন্তত আশা করা যেত, যারা জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আবার কখনো না কখনো দেখা হবে। মানুষের মায়া বড়ো বেশি, কারুকেই ছাড়তে ইচ্ছে করে না, মনে হয়, যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন সবাই থাক।

সুতবাং, রাত্তিরবেলা ঐ রকম সব শব্দ শুনে আমার ভয় হয় না। একদিন গভীর রাত্রে শুনতে পেলাম, আমার জানলায় কে যেন ঠক ঠক করে শব্দ করছে। কেউ যেন আমায় গোপনে ডাকছে, এই রকম একটু থেমে দুবার করে ঠক ঠক শব্দ। জানি, স্বপ্ন নয়, কেননা অন্ধকারেও আমি আমার সম্পূর্ণ শরীর দেখতে পাচ্ছি, মশাবিব আয়তন রেখাও স্পষ্ট, একদিকের জানলার একটা ভাঙা শার্শী দিয়ে ঢুকছে চাঁদের আলো। শুধু মাথার মধ্যটা হাল্কা, খুব হাল্কা। সেই হাল্কা বোধের মধ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচল। যুক্তি বলছে রাত্তির আড়াইটের সময় জানলায় ঠক ঠক করার মতো মানুষ তোমার চেনা কেউ-ই নেই। সুতরাং, ও শব্দটা আর কিছুই নয়, জানো তো, টিকটিকি যখন আরশোলা ধবে—তখন বারবার মাথার ঝাপটা দিয়ে আরশোলাটাকে আগে মেরে ফেলে, তখন খায়। সুতরাং, ওটা আর কিছুই নয়, টিকটিকির ঝাপটানি। আবার যুক্তির বিপরীত যে আচ্ছন্নতা—সেখান থেকে মনে হচ্ছে—কিন্তু টিকটিকি কি ঠিক ওরকম নির্দিষ্ট সময় অন্তর আওয়াজ করে? অবিকল মানুষের মতন? আওয়াজটা এমন, যেন কারুর ঠিক ঐ সময়ে এসে জানলায় টোকা মেরে সংকেত জানানোর কথা ছিল। বেশ কিছুক্ষণ আমি সেই আওয়াজটা শুনলুম। টিকটিকি না কোনো মানুষের সঙ্কেত—এই দুই সন্দেহের দোলায় আমি দুলতে লাগলুম। ভূত হবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না—ভূতরা অশরীরী—ইচ্ছে করলে তারা হাওয়া হয়ে ঘরে ঢুকতে পারে—জানলায় ঠক ঠক করবে কেন! আর থাকতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে? সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটা থেমে গেল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, কে? এবার ফিসফিসে

গলায় উত্তর পেলাম, আমি! আমি!—সেই গলার আওয়াজটা এমন, যেন, চিনতে পারছ না আমি কে? আমারই তো আসার কথা ছিল। পুরুষের গলা। তবু, আমি জিজ্ঞেস করলুম আবার, কে? আর কোনো উত্তর নেই। আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলুম, না, আর কোনো শব্দ হলো না। তখন মনে হলো, তা হলে টিকটিকিই। 'আমি' কে বলল? হাওয়া—হাওয়ায় শব্দ। পরমুহূর্তেই আমি দ্রুত উঠে এসে আলো জ্বেলে বারান্দায় এলুম। জানলায় কেন, আশেপাশে কোথাও কোনো টিকিটিকি নেই। আর কেউ-ই নেই। একটা মসৃণ চাদরের মতন নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে —হাওয়া তাকে আন্দোলিত করছে না পর্যন্ত। কিছুই লাভ হলো না উঠে এসে, শুধু শুধু ঐ আচ্ছন্ন অবস্থাটা কেটে গেল।

আর একদিন ঐ রকম অবস্থার মধ্যে—আমি যখন ছেলেবেলার কথা ভাবছি, তখন হঠাৎ শুনলাম, আমার পাশে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গভীর দুঃখের নির্জন বুক-চাপা কান্না। ধড়মড় করে পাশ ফিরলুম। কেউ নেই। আলো জ্বাললুম—ঘরের দরজা জানলা বন্ধ, ঘরেও কেউ নেই। তা হলে কি আমিই কাঁদছিলুম? আমার এক বন্ধুর ঠাকুর্দাকে দেখেছিলুম—তিনি ঘুমের মধ্যে নিজের নাক ডাকার আওয়াজে নিজেই জেগে উঠতেন। একা ঘরে প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন—কে? কে? স্বপ্ন দেখতে দেখতে অনেকে ফুঁপিয়ে কাঁদে—তা হলে আমিও কি, না, আমার চোখের পাশে জল লেগে নেই, তা ছাড়া আমি স্বপ্ন দেখছিলুম না—ছেলেবেলার কথা ভাবছিলুম—আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু শব্দটাও এত স্পষ্ট শুনেছি—যে অবিশ্বাস হয় না। রাত্তিরবেলা অনেক সময় অনেক দূরের শব্দও খুব কাছের মনে হয়—দূরে কোথাও এই মধ্যযামে কেউ আকুল হয়ে কাঁদছে—আমি তাই শুনতে পেলাম? বিশ্বাস হয় না। কিংবা, ভেনিসের সেই হাতুড়ে ডাক্তার ফ্রয়েডের ধারণা অনুযায়ী—ছেলেবেলায় আমি কারুকে কাঁদিয়েছিলাম—অবচেতন মনে সেইটাই আবার শুনতে পেয়ে আমায় জেগে উঠতে হলো? ধুৎ! সারাজীবনে অনেক মানুষই অনেক মানুষকে কাঁদায়—একা মাঝরাতে সেই কান্নার স্বর শুনে চমকে উঠতে হবে কেন? আবার আলো নেবাতে যাব, হঠাৎ চোখে পড়ল—আমার মশারির মধ্যে একটা সুন্দর রুপোলি মথ আটকা পড়ে ফরফর করে উড়ছে। তা হলে কি এই মথের ফরফরানিটাকেই আমি কারুর আকুল কান্নার ফোঁপানি হিসেবে শুনেছিলাম? আলমারির মাথা থেকে একটা টিকটিকি এই সময় ডেকে উঠল, ঠিক ঠিক ঠিক।

ভারি সুন্দর এই ঘুম আর জাগরণের মাঝখানের অবস্থাটা। দুর্লভ নেশার মতন। স্বপ্নের জগৎ উদ্ভট আর অবাস্তব, জাগরণের জগতটাও তাই। কিন্তু এই

মাঝখানের অবস্থাটা—যখন চৈতন্যের প্রান্তসীমায়—তখন হাওয়া উত্তর দেয় 'আমি', 'আমি', মথের ফরফরানির মধ্যে শোনা যায় মানুষের কান্না, গাছের পাতাগুলো প্রশ্ন করে, কেমন আছ ? কেমন আছ ?—টিকটিকি মনের কথার জবাব দেয়, ফুলদানির ওপর এক ঝাঁক পরী এসে বসে হাসাহাসি করে। আমি বিভোর হয়ে সেই সময়টা উপভোগ করি। চোখ বন্ধ হয়, চোখ খোলা, কান খোলা—শরীর জেগে আছে, শুধু মাথার মধ্যটা হাল্কা, খুব হাল্কা—তাই সব কিছুর মানে বদলে যায়। এই অবস্থার মধ্যেই কি শঙ্করাচার্য মায়াবাদ উপলব্ধি করেছিলেন ?

প্রায় রাত্তিরেই আমার এই রকম অনেক চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়। আর একটা ঘটনা বলে শেষ করছি। মশারির মধ্যে ঢুকে সিগারেট টানা বিপজ্জনক—একবার ঘুমিয়ে পড়ার ফলে তোষক পুড়িয়ে, ঘরে আগুন জ্বেলে জীবন্ত দগ্ধ হতে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। আজকাল আর করি না, কিন্তু এক-একদিন রাত্রে তৃষ্ণা আর কিছুতেই মেটে না। অনবরত গলার মধ্যে কষ্ট পেতে ইচ্ছে করে। সেই রকম এক রাত্রে, মাথার পাশে অ্যাশট্রে নিয়ে শুয়ে পর পর সিগারেট টানছিলুম। মশারি ফেলিনি তখনো। কয়েকটা সিগারেট শেষ করার পর আলো নিবিয়ে শুয়ে আছি, তখন ঐ রকম আচ্ছন্ন অবস্থা—ঘুম আর জাগরণের দোলাচলে আবিষ্ট হয়ে আছি। হঠাৎ হাতেব ধাক্কায অ্যাশট্রেটা ছিটকে নীচে পড়ে অনেক খানি গড়িয়ে গেল। অ্যাশট্রেটা মাটিতে গড়িয়ে যাওয়ার যে আওয়াজ—তার মধ্যে আমি স্পষ্ট একটি মেয়ের গলা শুনতে পেলাম। সেই কণ্ঠ আমায় বলছে, আবার তুমি অত বেশি সিগারেট খাচ্ছো ? ছিঃ।—আমি একেবারে আমূল চমকে উঠলাম। অত্যন্ত চেনা গলা। মেয়েটার নাম ছিল অনু। টানা দুটি কোমল চোখ, বাঁশীর শব্দের মতন সুন্দর গলার আওয়াজ ছিল তার। ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়ি—তখন অনুর জন্য আমি পৃথিবীটাকে তুচ্ছ করতে পারতুম। এমন ঈর্ষাপরায়ণ ছিলুম যে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে অনুকে একটা কথা বলতে দেখলেও সহ্য করতে পারতুম না। অনু বলেছিল, তুমি প্রতিজ্ঞা করো আর সিগারেট খাবে না। যদি খাও তা হলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব না, কথা বলব না, কিছু না।—আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। সেই অনু আজ মধ্যরাত্রে আমার সঙ্গে আবার কথা বলছে ?

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। আমি উঠে অ্যাশট্রেটা কুড়িয়ে এনে আবার একটা সিগারেট ধরালাম। চালাকি পেয়েছে ! আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি—কক্ষনো ভাঙি না। অনুর সঙ্গে যতদিন দেখা হতো—তখন আর সিগারেট সত্যিই খাইনি। কিন্তু অনুই বা সতেরো বছর বয়সে মরে গেল কেন ? ওর কি মরে যাবার কথা ছিল ? ও বলেনি, সিগারেট না খেলে ও চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে ? ও কেন কথা রাখেনি ? আমার বুঝি অভিমান নেই ? রাগ নেই ?

২০

মন খারাপের কথা কারুকে বলতে নেই। প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা রকম মন খারাপ থাকে, গোপনতাই তার পবিত্রতা।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক মানুষের মতই আমি সুখে আছি। স্বার্থপর ছাড়া সুখী হওয়া আজ আর বিশেষ কারুর পক্ষে সম্ভব নয়, আমিও পরিমিতভাবে স্বার্থপর। দেশে এত দুর্যোগ দুদিন গেল, তবু এর মধ্যে, সত্যিকথা বলতে কি, আমি প্রতিদিন দু'বেলাই যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য পেয়েছি। শৈশবে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ছিলাম শহর থেকে বেশ দূরে এক পল্লী অঞ্চলে, সে-সময় শুধু আলু সেদ্ধ খেয়ে পেট ভরাতে হয়েছিল, এইটুকু মনে আছে—তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর বিনা আহারে কাটাতে হয়নি একবেলাও। বড়োজোর পোনা মাছের বদলে তেলাপিয়া খেতে হয়েছে, ভাতের বদলে শুকনো রুটি—কিন্তু একে খাবারের কষ্ট বলা যায় না। পোশাক পরিচ্ছদেরও কোনো অভাব নেই, পুজো-আর্চ্চা কিংবা নেমন্তন্নের দিনগুলোর জন্য কাচানো ধুতি ঠিক জমা থাকে, অন্যদিন আটপৌরে ট্রাউজার্স—তারও ফ্যাশন অনুযায়ী পায়ের ঘের ক্রমশ সরু হচ্ছে। দু'তিন জোড়া জুতোও মজুত। আমার ঘরের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে না, বরং বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলে পায়ের ওপর নরম রোদ খেলা করে। ট্রাম-বাসে খুব ভিড় হলে মাঝে মাঝে অনায়াসেই ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতা করতে পারি। এই শহরে আমার বন্ধু-প্রিয়জনের-শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই। আমার স্বাস্থ্য প্রায় ভালোই। আমি রসিকতা শুনে হাসতে পারি। এই দেশ কিংবা ভারতবর্ষের স্ট্যাণ্ডার্ডে আমি যথেষ্ট নিরাপদ এবং সুখী মানুষ বলা যায়।

তবু মাঝে মাঝে কেন ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে ? দুরন্ত বেগে ছুটে আসা গাড়ি দেখলে, এক এক সময় কেন হঠাৎ প্রবল ইচ্ছে হয় সামনে লাফিয়ে পড়ি ? কেন কখনো কখনো কোনো নিরাবয়ব মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আন্তরিক কাতরতার সঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয়, আমার ক্ষমা করো ? কেন ?

ভাত খেতে বসে তরকারি কিংবা মাছের ঝোলে হঠাৎ একটা চুল দেখতে পেলে বুঝতে পারি সেটা কারুর দোষ নয়। তবুও অবুঝভাবে মন খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময় আমি আমার প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ঐরকম কোনো অদৃশ্য চুলের অস্তিত্ব টের পাই, আমার গা গুলিয়ে ওঠে। অনেক সময় ধপধপে পাট-ভাঙা পোশাক পরতে গিয়েও অকারণেই মনে হয়, তাতে যেন বমনোদ্রেককারী ময়লা লেগে আছে, আমার শরীর কুঁকড়ে ওঠে। স্পষ্ট টের পাই, অনেক স্বার্থপরতার বিনিময়ে আমি আমার সুখ ক্রয় করে চলেছি। চোখ শুকনো, আজকাল আর কান্না পায় না—কত বছর যে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিনি, তা মনেও পড়ে না

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, নিরালায় বসে যদি একদিন ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারতুম, বুকটা হাল্কা হতো। কিন্তু কাপুরুষ বা মেয়েদের মতন কেন কাঁদব, তাও যে জানি না।

সকালবেলা ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে দু'খানা খবরের কাগজ পড়ি অনেকক্ষণ ধরে। কত দীর্ঘকাল সংবাদপত্র আমাকে কোনো সুসংবাদ দেয়নি, তবু কোন প্রত্যাশায় আমি কাগজ মুখের সামনে মেলে সকালগুলো ব্যয় করি? সত্যিই সুসংবাদের প্রত্যাশায়, না সাধ করে দুঃখ পাবার জন্য? খবরের কাগজ পড়ার পর প্রতিদিন সকলে আমার ব্যাখ্যাহীনভাবে মন খারাপ থাকে।

হয়তো রাস্তা দিয়ে কোনো নারীর সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছি মনোরম সন্ধেবেলা, অল্প শীতের হাওয়া দিচ্ছে, সার্কুলার রোডেব একটা গাছে রং-বেরঙের ঝলমলে আলো জ্বলছে বড়োদিন উৎসবের প্রস্তুতিতে। ইচ্ছে হলে আরো বেড়ানো যায়, ইচ্ছে হলে কোনো মোলায়েম রেস্তোরায় বসে উষ্ণ কফির সঙ্গে সঙ্গে সোহাগ-বাক্য বিনিময় করা যায়, হাতে হাত ছুঁয়ে যেতে পারি পরস্পরের তবঙ্গ। এই তো জীবন, এই তো সুখ। কে তা অস্বীকার করবে। তবু কিছুক্ষণ পাশপাশি হাঁটার পর আচমকা খেয়াল হয়, অনেকক্ষণ আমি কোনো কথা বলিনি। পার্শ্ববর্তিনী নারী সকৌতুকে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার, তোমার কপালটা কুচকে আছে কেন? আমি সচকিত হয়ে হাত দিয়ে নিজের কপাল স্পর্শ করি। সত্যিই কপালে অনেকগুলো সিঁড়ি। হাত দিয়ে জলে আকা ছবিব মতন সেগুলো মুছে দেবার চেষ্টা করি। কেন এরকম? আমার তো কোনো দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয়।

এসবের কোনোই মানে বুঝতে পারি না। কারণ খুঁজতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছি। মাঝে মাঝে শুধু যেন অস্পষ্ট ঝিলিক দেখতে পাই।

হয়তো আজ হরতাল। সকাল থেকেই সে জন্য আমার মন খারাপ। অথচ, কেন? সব মানুষই ছুটি চায়, আচমকা ছুটিতে তো আরো বেশি আনন্দ। ইস্কুল-কলেজে পড়ার সময় কমিটির সেক্রেটারি কিংবা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে কিরকম মহানন্দে কলরব করতে করতে সিনেমা দেখতে যেতুম, মনে নেই? রোজ কারুর অফিস যেতে ভালো লাগে না, আমারও লাগে না। হরতালের দিন তো অবিমিশ্র ছুটি। ইচ্ছে হলে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা যায়, গোয়েন্দা গল্পে মগ্ন থাকা যায়। ট্রাম-বাস না হয় বন্ধ, কিন্তু কাছাকাছি বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে তাসের হুল্লোড় তো জমানো যায় অনায়াসেই। এই তো আরাম, এই তো সুখ। কিন্তু আমার মন খারাপ হয়। শুয়ে শুয়ে আমি মন খারাপের কারণ খোঁজার চেষ্টা করি। হঠাৎ মনে হয় প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে জেলে আটকে কারুকে যদি প্রচুর সুখাদ্য এবং উত্তম বস্ত্রও দেওয়া হয়—তবু কি সে সেই অবস্থাকে

সুখের মনে করবে ? আমি সেই রকম বন্দী। আমাকে এইভাবে বন্দী করা হয়েছে, সেটাই আমার মন খারাপের আসল কারণ নয়। আসল কারণ, আমি এই বন্দীত্বের অবসানের জন্য কোনো চেষ্টাও করছি না। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিবাদ জানানোর জন্য দেশব্যাপী হরতাল ডাকা একটা কাপুরুষতা, এবং আমিও ডবল কাপুরুষ, এর সক্রিয় প্রতিবাদ করার সাহস আমার নেই। আমার আত্মীয় পরিজনের নিরাপত্তা, আমার দু'বেলার খাদ্য আমার শৌখিন পোশাক, আমার সন্ধেবেলার বেড়ানোর অধিকার—এইসব সামান্য সুখ কেনার জন্য আমাকে স্বার্থপর ও কাপুরুষ হয়ে আমার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ গোপন রাখতে হবে। হরতালেরও প্রতিবাদ করি না, যে-সব কারণে হরতাল ডাকা হয়—তারও প্রতিবাদ করতে পারি না। আমি পুলিশের গুলির বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে যাইনি, আবার বিপক্ষের ইট বা হাতবোমার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে চাই না। তাহলে আমি কোথায় আছি ? আসলে আমি একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি, অনেকটা স্বেচ্ছায়। যে রাস্তায় গণ্ডগোল—সেইসব রাস্তা আমি সযত্নে পরিহার করি, উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়। আমি ব্ল্যাক মার্কেটে বেশি দামে চাল কিনি। এইসব ক্ষুদ্রতার বিনিময়ে আমার সামান্য সুখ, আমার স্বস্তি।

আমি কার মতো ? পাশাপাশি আমরা দু'জনে এক বাসে উঠলুম। আমার পাশের সেই অপরিচিত যুবকটির চেহারা মাঝামাঝি ধরনের, দাড়ি কামানো, পরিষ্কার ভাবে চুল আঁচড়ানো, পাট-ভাঙা প্যান্ট ও সার্ট, জুতো চকচকে, হাতে একটি গ্ল্যাণ্ডস্টোন ব্যাগ, চোখে রোদ-চশমা। ঐ রোদ-চশমা ও ব্যাগটি বাদ দিলে যুবকটির সঙ্গে আমার খুব বেশি অমিল নেই। আমি যুবকটির শরীর ও মুখের প্রতিটি রেখা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলুম। খানিকটা ভিড়ের বাসে আমরা পাশাপাশি দাড়িয়ে, যুবকটি জানেও না অতিশয় দক্ষ গোয়েন্দার মতন আমি তার দিকে নজর রাখছি। ওর সঙ্গে আমার মিল দেখে আমি ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে যেতে লাগলুম। যুবকটির মুখের ভঙ্গি হাল্কা ধরনের, চঞ্চল ভাবে এদিকে ওদিকে চাইছে, মেয়েদের সীটের প্রতিটি মেয়ের মুখে বার তিনেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে একজনের দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতে ও পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করার আগে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিল, আশ্চর্য, যুবকটি আমার ব্রাণ্ডের সিগারেট খায়। ঐ যুবকটিও কি আমারই মতন বন্দী? ওরও কি অত্যন্ত অকারণে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় ? একথা জানার এমন দুরন্ত ইচ্ছে হচ্ছিল আমার যে আমি ঠিকই করেছিলুম, ওর কাঁধে টোকা মেরে ওকে এ কথাটা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করব। কিন্তু সেই সময়ই যুবকটি একটা কাণ্ড করল। খুবই সাধারণ ব্যাপার বলতে গেলে। একটি সীট খালি হয়েছিল, সঙ্গে

সঙ্গে যুবকটি স্প্রিং-এর মতন শরীর সক্রিয় করে আরো দুটি যুবা ও এক বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে অন্ধের মতন সীটে বসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ আমার অহংকার জেগে উঠল। না, আমি ঐ যুবকটির মতন মোটেই নয়। আমি দেশের জন্য লড়াই করিনি কিন্তু ট্রাম-বাসের সীটের জন্য লড়াই করব—এ পরিণতি আমার এখনো হয়নি। আমি এক জায়গায় থেমেছি। কিন্তু ঐ যুবকটি ঘুমন্ত, ও ঘুমের ঘোরে হাঁটছে এবং বেঁচে আছে।

আমি কি রামখেলাওনের মতন? আমাদের বাড়ির পাশের বস্তিতে রামখেলাওন থাকে। গলায় পেতলের চাক্তি ঝোলানো রামখেলাওনকে আমি মাঝে মাঝে টিউবওয়েলের পাশে দাঁড়াতে দেখি। আগে বিশাল তাগড়া জোয়ান ছিল রামখেলাওন, এখন অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। স্পষ্টই পেটভরা খাবারের অভাব কিংবা অপুষ্টিকর খাদ্যের ফল। তবু রামখেলাওন ওর ঝকঝকে কাঁসার থালাটা নিয়ে টিউবওয়েলের পাশে এসে দাঁড়ায়, চেঁচিয়ে ওঠে, আয়, আয়, রে-রে-রে আঃ, আঃ! সঙ্গে সঙ্গে গুটি চারেক কুত্তা কোথা থেকে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে আসে। রামখেলাওন তার সামান্য খাদ্য থেকেও দু'খানা রুটি রোজ বাঁচিয়ে রাখে, সেইগুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে মহানন্দে ছুঁড়ে দেয়। টিউবওয়েলে আঁচাবার সময় রোদ্দুরের আভায় রামখেলাওনকে মনে হয় একজন পরিতৃপ্ত মানুষ। ওর মনে গ্লানিবোধ নেই। কিন্তু রামখেলাওনও ঘুমন্ত মানুষ, ওর চোখ দেখে বোঝা যায়।

না, আমি রামখেলাওন কিংবা বাসের ঐ সীট-লোভী যুবকটির মতন নই। আমার মতন মানুষের একটা বিরাট দল আছে—কিন্তু আমরা কেউ কারুকে কোনোদিন চিনতে পারব না। আমরা প্রায় নিজের তৈরি এক-একটা দুর্গ বা বন্দীশালায় লুকিয়ে আছি। কিন্তু, আমাদের সকলেরই অনিদ্রা রোগ।

২১

বাসে উঠল দুটি যুবতী মেয়ে। একজনের চোখে সোনার চশমা, অন্যজনের কপালে সবুজ টিপ। দু'জনেরই চেহারা এমন যে, পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকেই চোখ বদলে তাকাতে হয়। একজনকে ফেলে আরেকজন রাখা যায় না।

একটিমাত্র সীট খালি। ওদের সৌন্দর্য যেমন প্রায় সমান, বসবার দাবিও দু'জনেরই সমান। সুতরাং সবুজ টিপ সোনালি চশমাকে বলল, তুই বোস্।

সোনালি চশমা বলল, তুই বোস না!

—না, তুই।

—আহা, তুই বোস।

সময় দুপুর। অল্প ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অল্প গরমে অস্বস্তি বোধ করছিলুম, মেয়ে দুটি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় সুগন্ধ ভেসে এল, চোখেও শান্ত প্রলেপ পড়ল। আরো মিনিট কুড়ি বাসে থাকতে হবে, কিন্তু কুড়ি মিনিট এখন আর খুব দীর্ঘ বোধ হলো না। অন্যদিকের মেয়েলি সীটে দু'জন মহিলার পাশে একজন পুরুষ, সেই পুরুষটি এমনই বে-রসিক যে এই নতুন যুবতী দুটির দিকে একবারও চেয়ে দেখল না, মনোযোগ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফুটপাত, আঁস্তাকুড়, ট্রাম-লাইন দেখতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বসল সোনালি চশমা, সবুজ টিপ দাঁড়িয়ে। সোনালি চশমা বলল, তুই ওদিকে গিয়ে বোস না। ওদিকে তো একটা সীট খালি আছে।

সবুজ টিপ ঝংকারময় গলায় উত্তর দিল, খালি কোথায় ? লোক বসে আছে তো!

—উঠতে বল না!

—না। লোককে উঠিয়ে আমি বসতে চাই না।

—ঐ ভদ্রলোকেরই উচিত সীট ছেড়ে দেওয়া।

—তুই কি করে বুঝলি যে—? সবাইকে কি চেহারা দেখেই বোঝা যায় ?

দু'জনে চোখাচোখি করে হাসল। বুঝতে পারলুম আসলে, ওরা বলতে চাইছে চেহারা দেখলেই কি বোঝা যায় ভদ্রলোক ? কিন্তু ওপাশের যে লোকটি সীট না ছেড়ে বাগ্রভাবে বাইরে তাকিয়ে আছে, তার ওপর আমার খুব রাগ হলো না। তা হলে, আবার, আমার চোখ নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হতো। মানুষের যদিও দুটো চোখ, কিন্তু একসঙ্গে কেউ দু'দিকে কখনো তাকিয়ে দেখতে পারে না।

মেয়ে দুটি বেশ সপ্রতিভ, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার একটু, উঁচু গলাতেই নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, কে শুনছে না শুনছে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে হেসে উঠছে জড়তাহীন গলায়। রসিকতাগুলো একেবারে খেলো নয়, খানিকটা সুশিক্ষার ছাপও আছে।

আমি হঠাৎ মেয়ে দুটির কাছে খুব কৃতজ্ঞ হয়ে পড়লুম। ওদের আমি নাম জানবো না, জীবনে আর কখনো দেখাও হবে না, মাত্র এই কুড়ি মিনিটের বাস জার্নিতে ওরা আমার বিরক্তি অপহরণ করে নিল, আমার চোখের দৃষ্টিকে সুসহ করে দিল, তিন-চারজন পিছনের পুরুষের বাজারদর বিষয়ে হেঁড়ে গলায় আলোচনা শুনতে যে আমি বাধ্য হলুম না—তার বদলে ওদের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেলুম এজন্য মেয়ে দুটির প্রতি আমার খুবই

র, তেমনি সারা বাসের বিরক্তিকর দুপুরের

ভিড়ের মধ্যে এই দুটি ঝলমলে মেয়ের উজ্জ্বল কথাবার্তা সব জিনিসটাকে সুন্দর করে দিল।

হঠাৎ এক সঙ্গেই দুজন পুরুষ উঠে গিয়ে একটা পুরো সীট খালি হয়ে গেল। এবার আমার বসবার পালা। কিন্তু সবুজ টিপ তখনো দাঁড়িয়ে, সুতরাং তাকে বসবার সুযোগ দিয়ে আমি দাঁড়িয়েই রইলুম। সবুজ টিপও দাঁড়িয়ে রইল। সোনালি চশমা বলল, এই সীট খালি হয়েছে বোস না।

সবুজ টিপ বলল, না—

সোনালি চশমা : কেন?

—পুরুষদের সীটে আমি বসব কেন?

—ওখানে একজন পুরুষও তো মেয়েদের সীটে বসেছে।

—অন্য কেউ বে-আইনী কাজ করলে আমিও কি করব?

—এর মধ্যে আইন আবার পেলি কোথায়? বসার জায়গা নিয়েও আইন! যে-যেখানে খালি পাবে বসে পড়বে—

সোনালি চশমা সবুজ টিপের হাত ধরে জোর করেই বসিয়ে দিল। তখনো পাশে একটা জায়গা খালি। আমি ইচ্ছে করলেই বসতে পারি, কিন্তু মেয়েরা মুখ ফুটে না বললে আমি ভরসা পাই না। একবার একজন মধ্যবয়স্ক মহিলার পাশে আমি বসবার পর তিনি হঠাৎ ফুঁসে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি বসলে যে বাছা? গঙ্গাস্নান করে এসেছি, তুমি ব্রাহ্মণ তো? আমি ব্রাহ্মণ নই, শুদ্র—একথা শুনে তিনি এমন কটমট করে তাকালেন—

কিন্তু, এই ঝকঝকে তন্বী যুবতী নিশ্চিত সে-রকম হবে না। কিন্তু, ঐ যে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে, আর কি এখন বসা যায়? মেয়েদের পাশে জায়গা থাকলে—প্রথম সুযোগেই বসতে হয়, একটু দেরি করলে আর হয় না, খানিকটা বাদে হঠাৎ ঝুপ করে বসে পড়লে কী রকম বিসদৃশ দেখায়।

সোনালি চশমা খিলখিল করে হেসে উঠল, ফিসফিস করে সবুজ টিপকে বলল (আমি শুনতে পাচ্ছি), তুই এমন গোমড়া মুখ করে আছিস, তোর পাশে কেউ বসতেই চাইছে না।

—আমার কোনো আপত্তি নেই, যে কেউ বসতে পারে!

—তুই বললি না, শুধু শুধু দুজনের জায়গা—

—তুই উঠে আয় না।

—সেই একই তো কথা। আমার পাশে [illegible]—আবার দুজনের কুল কুল করা হাসি। সে হাসির কারণ কি কেউ জানে না। আমি নার্কি ঐ মেয়ে দুটি মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে পরিবেশ ভাবাচ্ছে, সে দায়িত্বটা থেকে আমিও বাদ যাইনি।

কী প্রাণবন্ত মেয়ে দুটি! বাতাসে ম্যাজিকের ছোঁয়া লাগিয়ে এমন সুন্দর দুপুরে বাসযাত্রা আমার কোনোদিন হয়নি, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলুম। মনে মনে সে মেয়ে দুটিকে আমি যুগ্মভাবে 'মিস ক্যালকাটা' বলে ঘোষণা করে দিলুম।

সবুজ টিপ বলল, সত্যি তো কেউ বসল না।

তখন সমগ্র পুরুষ সমাজের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়ল। দুটি সাহসিনী যুবতী যদি এত সহজ ও অনাড়ষ্ট হতে পারে—তবে পুরুষরাই বা কেন ক্যাড হয়ে থাকবে? আমি ঝুপ করে সবুজ টিপের পাশে বসে পড়লুম, গলার স্বর আমার পক্ষে যতটা সম্ভব মিষ্টি করে বললুম, ধন্যবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজি ঘটে গেল। মেয়ে দুঁটির মুখ মুহূর্তে শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেল, দু'জনে আর একটিও কথা না বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওদের দু'জনেরই মুখে স্পষ্ট ভূত দেখার ভয়। আমি বিষম নার্ভাস হয়ে পড়লুম। আমি তো বেশ দূরত্ব রেখেই বসেছি, মুখখানা হাসি হাসি করেই রেখেছি, এবং বিনীত কণ্ঠে বলেছি, ধন্যবাদ! তাতেই অমন হাসিখুশি দুটি কন্যা হঠাৎ যেন কুঁকড়ে গেল, কেন নিভে গেল মুখের আলো, কেন থেমে গেল কথার খুশি?

মেয়েদুটির নাম আমি কোনোদিন জানবো না, ওদের সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না, এবং আমি কোনোদিনই জানতে পারব না, কেন মুহূর্তে ওদের কলহাস্য থেমে গিয়েছিল। ঐ কুড়ি মিনিটেব বাস রাস্তা ওবা আমাকে কৃতজ্ঞ করেছিল, সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আমি বলেছিলাম ধন্যবাদ। তবে? কোথাও বোধহয় একটা আইন আছে. একটা সীমারেখা, সভ্যতা শুধু এই পর্যন্তই এগিয়েছে যে, বাসে অপরিচিত মেয়ের পাশে কোনো পুরুষ আজকাল বসলেও বসতে পারে, কিন্তু কথা বলা চলবে না! কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধনাবাদ বলা তো সভ্যতা, তাও চলবে না?

হঠাৎ মেয়ে দুটি নামার জন্য উঠে দাঁড়াল। আমার বিষাদ ও অস্বস্তি কাটাবার জন্য, আমি যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, ধনাবাদ। মেয়ে দুটির মুখ এমন—যেন পুরো মুখই ঘোমটায় ঢাকা! ধীরপদে বাস থেকে নামল, তারপর পথে দাড়িয়ে সোনালি চশমা ও সবুজ টিপ এই দু'জনেই খরদৃষ্টি হেনে আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় বলল, অসভ্য কোথাকার!

ওরা জানল না, সেই মুহূর্তে ওদের আবার কি রকম সাধারণ দেখাচ্ছিল। সাধারণ, আর সবার মতন। তখন আমি ওদের যুগ্ম 'মিস ক্যালকাটা' পদবী ফিরিয়ে নিলাম।

২২

অঞ্জন বলল, ওর এখন কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না, পৃথিবীকে ও আগে যেরকম দেখতে পেত, এখনো সেইরকমই পায়, ঘাড়ে ঘুরিয়ে তাকাতে হয়।

আর সবাই সমস্বরে অঞ্জনকে সমর্থন করল, সবাই বলল, সত্যি কিছু যায় আসে না, দুটো চোখ থাকার খুব বেশি উপযোগিতাই টের পাওয়া যায় না।

এই সব সান্ত্বনার কথা। অঞ্জনের একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। মোটর গাড়ির দুর্ঘটনায়। সে দুর্ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে চাই না, প্রত্যেক মানুষকেই অনেক দুঃখ-বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—সুতরাং অন্যের দুঃখ-বিপদের কথা বেশি শুনে লাভ কি।

চোখটা বাঁচাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিছুতেই কিছু হলো না—তবে সৌভাগ্যের কথা এই, ডান চোখটার কোনো ক্ষতি হয়নি। অঞ্জন এখন সুস্থ হয়ে উঠে চোখে চশমা পরে।

আমাদের যাদের দুটো করে চোখ এখনো আছে, আমরা চোখ না থাকার দুঃখ কি বুঝব? অঞ্জনকে ফাঁকা সান্ত্বনা দেবার কোনো মানে হয় না। অঞ্জনের অবস্থাটা বোঝাব জন্য আমি অন্যের অগোচরে একটা চোখ বন্ধ করে দেখার চেষ্টা করলুম। তাতে মুস্কিল এই, একটা চোখ জোর করে বন্ধ করলে অন্য চোখটাও ছোট হয়ে আসে। যাই হোক, একটা চোখ হাত দিয়ে চেপে, অন্য চোখটা বড়ো বড়ো করে মেলে দেখলুম, এক পাশে অন্ধকার থাকলেও একটা দিকের সব কিছুই ভালো করে দেখা যায়—কোনো অসুবিধে হয় না বটে। আর নিজের নাকটা বেশ চোখে পড়ে, দু'চোখ খোলা থাকলে নাকটা আমরা দেখতে পাই না, এখন নাকটাই এক দিকের দৃশ্য আড়াল করে রাখে।

যাক, অঞ্জনকে তা হলে খুব বেশি অসুবিধের সত্যি পড়তে হবে না। অন্তত, দুটি চোখই যে যায়নি, কিংবা গাড়ির দুর্ঘটনায় গোটা প্রাণটাই যে হারায়নি—সেই জন্যই ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

বন্ধুরা যখন অঞ্জনকে খুব সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং দুটো চোখ থাকা আর একটা চোখ থাকায় কোনোই অসুবিধে নেই—এরকম বোঝাচ্ছে, তখন আমি আলটপকা বলে ফেললুম, একেবারে অসুবিধে যে হবে না, সে কথা বলা যায় না।

—কেন?

—একটা অসুবিধে তো হবেই। অঞ্জন আর মেয়েদের দেখে এক চোখ টিপে তাকাতে পারবে না।

আশা করেছিলুম, সবাই হাসবে। অঞ্জনও হাসতে হাসতে বলবে, যা, যা! বরং মেয়েরা ভাববে আমি সব সময় তাদের দিকে একচোখে তাকিয়ে আছি!

ভেবেছিলুম, এ ব্যাপার নিয়ে ফাঁকা সান্ত্বনা দেবার বদলে হাসিঠাট্টা করাই ভালো। কিন্তু তা হলো না। অঞ্জন উৎকট গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যরা জোড়া জোড়া চোখে আমার দিকে ভৎর্সনার সঙ্গে তাকাল!

আমার যা বরাত। ঠিক জায়গায় কিছুতেই হাসির কথাটা বলতে পারি না! ভুল জায়গায় রসিকতা করতে গিয়ে বোকামির একশেষ করে ফেলি। ভালো উদ্দেশ্যে কিছু করতে গেলেও খারাপ হয়ে যায়।

অঞ্জন বিমর্ষ ভাবে বলল, আমার দরকার নেই, তুই-ই এখন থেকে যত ইচ্ছে ওরকম ভাবে তাকাবি!

—না, না, তুই ভুল বুঝেছিস। আমি ওভাবে বলিনি!

আমি একটা নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হিসেবে গণ্য হলুম, অঞ্জনের সঙ্গে আমার মন কষাকষি হয়ে গেল। অঞ্জনের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় না।

অঞ্জন জানে না, আমার ঐ ভুল রসিকতার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি আর তারপর থেকে মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাই না পর্যন্ত। লক্ষ্মণের মতন মেয়েদের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে কথা বলি। তবু আমি অঞ্জনের কাছে অপরাধী হয়ে রইলুম। লোকমুখে শুনতে পাই, অঞ্জন আমার সম্পর্কে যা মতামত প্রকাশ করে এখন, তাতে মনে হতে পারে আমি একটা হৃদয়হীন, নরাধম। আমার একটা চোখ উপড়ে যদি অঞ্জনকে দেওয়া যেত, তা হলেও আমি রাজি ছিলুম। কিন্তু চক্ষু ব্যাঙ্কে জীবিত মানুষের চোখ নেয় না।

কি আমার অপরাধ? একটা না হয় বাজে রসিকতা করেছিলুম, ওরকম তো অনেকেই করে। ভালো রসিকতা করতে না পারা তো মানুষের পক্ষে মারাত্মক দোষের নয়। অথচ অঞ্জনের সঙ্গে এক সময় কত বন্ধুত্ব ছিল, এক সঙ্গে একই মেয়ের প্রেমে পড়তাম দু'জনে। এক সিগারেট দুজনে বদলাবদলি করে খেতাম।

অঞ্জনের অফিসের বন্ধু অসিত আমাকে বলল, ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন, মানুষের শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে কক্ষনো রসিকতা করতে নেই। ওটা খুব টাচি ব্যাপার। যার যে শারীরিক খুঁৎ নেই, সে সেটা না থাকার দুঃখ কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

আমি বললুম, বাঃ, আমার শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে যে কত লোক রসিকতা করে? আমি একটু বেশি রোগা আর লম্বা বলে বন্ধুরা আমার নাম দিয়েছিল 'ঝুলঝাড়া'। আমি কি তাতে রেগেছি? আমার গায়ের রং বেশি কালো বলে, কখনো কখনো ওরা আমাকে বলে আবলুস লম্বুস! অঞ্জনও তো কতবার বলেছে, তাতে কি আমাদের ঝগড়া হয়েছে? অঞ্জনের গায়ের রং ফর্সা আর স্বাস্থ্য ভালো, ও কি করে আমার মতন কালো আর রোগা লোকের দুঃখ বুঝবে?

অসিত বিজ্ঞের মতন হেসে বলল, কালো ফর্সা-টর্সা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু চোখ থাকা-না থাকার ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক বুঝতে পারছেন না ? কথাতেই বলে, চক্ষুরত্ন! তাও যদি অ্যাকসিডেন্টে সেটা নষ্ট হয়—

—প্রাণে যে বেঁচে গেছে সেটাই আনন্দের ব্যাপার। আমি তাই আনন্দ করতে চাইছিলাম! আমি চাইছিলাম, ও যাতে নিজের দুঃখ নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে।

—সব দুঃখ নিয়ে হাসা যায় না!

তারপর অঞ্জন একদিন আমার বাড়িতে এল দেখা করতে। আমি এক চেয়ারে হেলান দিয়ে, আর এক চেয়ারে পা তুলে দিয়ে আলস্য করছিলাম, অঞ্জন ঘরে ঢুকে আমার সামনাসামনি দাঁড়াল। দুটি চোখ স্পষ্ট মেলে।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম, আরে, ভালো হয়ে গেছে ?

অঞ্জন উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নতি করেছে, সেজন্য আমি সেই মুহূর্তে পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। অঞ্জনেব মুখের সুন্দর শান্ত শ্রী আবার ফিরে এসেছে।

আমি অতি উৎসাহে ওব হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, কি করে হলো ? কবে অপারেশন করালি ?

একজন সাহেব ডাক্তার প্রতি বছর এখানে আসে গরীব লোকদের চোখের চিকিৎসা করতে—অঞ্জন তার সঙ্গে বিশেষ বন্দোবস্ত করে চোখের অপারেশন করিয়েছে। অনেক টাকা খরচ হয়েছে, তা হোক!

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতেই কথা বলছিল অঞ্জন, শেষকালে বলল, আমি চোখ ফিরে পেয়েছি, কিন্তু দু'চোখের দৃষ্টিশক্তি পাইনি। তাতে কিছু যায় আসে না—দেখার ব্যাপারে তো আমার কোনো অসুবিধে নেই!

—তার মানে ?

—আমার এ চোখটা পাথরের। পাথরের ঠিক নয়, প্লাস্টিকের, বিদেশেই শুধু এগুলো হয়—আমি খুব লাকি, এখানে করাতে পেরেছি। এখন দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। তুই-ও তো পারিসনি!

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই অঞ্জন বলল, আমি বিয়ে করছি, সামনের সপ্তাহে। তোকে নেমন্তন্নের চিঠি দিতে এসেছি!

আমি নেমন্তন্নের চিঠিটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলাম। অঞ্জন বলল, যাকে বিয়ে করেছি, তাকে এখনো বলা হয়নি। বছরখানেক যাক, তারপর না হয় বলব—দেখে তো কিছুই বুঝবে না। না বললে কোনোদিন জানতেও পারবে না।

আমি কোনো কথা বললাম না।

অঞ্জন কিন্তু খুব হাসিখুশির ঝোঁকে আছে। খুব হালকা ভাবে বলল, তুই বলেছিলি, আমি এক চোখ টিপে তাকাতে পারব না। এখন পারি, দেখবি?

অঞ্জন ওর ভালো চোখটা বন্ধ করে শুধু প্লাস্টিকের চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল। সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই একটু ভয় ভয় করতে লাগল আমার। এই চোখ কোনোদিন কাঁদবে না, কোনোদিন ঘুমোবে না, কোনোদিন অবাক হবে না—শুধু তাকিয়ে থাকবে!

অঞ্জন হো-হো করে হেসে বলল, কি রে, ঠিক হয়নি?

আসল চোখ নষ্ট হওয়ায় আমি রসিকতা করতে চেয়েছিলুম। আজ অঞ্জন আমার সঙ্গে হালকা মনে দেখা করতে এসেছে, আমি একটাও হাসি-ঠাট্টা করতে পারলুম না। সেই কৃত্রিম চোখের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, হ্যাঁরে, দেখলে বোঝা যায় না, আর কোনোই অসুবিধে হবে না তোর!

২৩

এই কলকাতা শহরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অফিসে ঢোকার মুখে একটা ব্যাপার দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলুম। বারান্দার কোণে তিনটে বাথরুম। তিনটে বাথরুমের দরজায় আলাদা করে লেখা আছে, পুরুষ, মহিলা, গেজেটেড অফিসার।

ধর্মসাক্ষী, আমাকে দশ হাজার টাকা মাইনে দিলেও আমি ঐ অফিসে গেজেটেড অফিসারের চাকরি করতুম না। কিংবা আমাকে দেওয়াও হবে না। পুরুষ কিংবা মহিলা কারুরই ওখানে গেজেটেড অফিসার হবার যোগ্যতা নেই। গিয়েছিলুম ঐ অফিসের একজন কেরানির সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু দু'একজন গেজেটেড অফিসারকে একটু দেখে আসার লোভ সামলাতে পারিনি। চেহারা দেখে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না।

অবাক হয়ে ভাবি, ঐ অফিসের লোকেরা দিনের পর দিন এরকম একটা উৎকট রসিকতা সহ্য করছে কি করে।

আজকাল অনেক রকম দেশলাই বেরিয়েছে। একটা নতুন দেশলাই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম, হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল। লেবেলে যে কথাগুলো ছাপা আছে, তার মধ্যে একটা বানান ভুল। প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি, ভাবলুম, ফাকটরি কথাটার কি দু'রকম বানান হয়? বাড়িতে এসে ডিকসনারি দেখে পর্যন্ত মেলালুম, না, হতে পারে না, ফাকটরি কথাটার শেষে 'আই' চলতে

পারে না! তাহলে এরকম একটা ভুল ছাপা কি করে চলছে? দেশলাইটার মার্কা আমি বলে দিতে পারব না, তাহলে তাঁরা বোধহয় আমার সঙ্গে মামলা করবেন। কিন্তু একটা দেশলাইয়ের ব্যবসা তো সহজ ব্যাপার নয়, বারুদ নিয়ে কারবার! নিশ্চয়ই ওদের একটা অফিস আছে, সেখানে প্রচুর লোকজন খাটছে, এই ভুলটা তাঁদের কারুরই চোখে পড়েনি? নাকি কিছু আসে-যায় না?

নানান রকম ভুল আর উল্টাপাল্টা জিনিসের কথা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে বেশ সময় কেটে যায়। আজকালকার অনেক পূজা-সংখ্যার উপন্যাসে দেখা যায় হঠাৎ পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে যাচ্ছে, চেহারা কিংবা বাড়ি-ঘরের বর্ণনা মিলছে না, ঘটনার সামঞ্জস্য থাকছে না। এখন অনেক লেখক তাড়াহুড়ো করে লেখেন, পরে হয়ত দ্বিতীয়বার ছাপার সময় ভুল সংশোধন করে দেন। কিন্তু স্বয়ং বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে এরকম মারাত্মক ভুল করেছেন। ভুল করাই বোধহয় ভারতবর্ষের ট্রাডিশন। যে-কোনো চরিত্রের বয়সের হিসেব করতে গেলেই তো গণ্ডগোল, তাছাড়াও রামায়ণের মূল ঘটনাতেও অসংগতি আছে। সীতাহরণের পর বেশ খানিকটা সাসপেন্স তৈরি করা হয়েছে। কে সীতাকে চুরি করল, সীতাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এসব বেশ আস্তে আস্তে উদঘাটিত করা হয়েছে। জটায়ুর মুখেই জানা গেল সীতা-লুণ্ঠনকারী হচ্ছে রাবণ। কিন্তু অতবড়ো রাজা রাবণ। তাঁর রাজত্বটা কোথায়—তা কেউ জানে না? রাবণ কোথায় থাকে—তা কেউ বলতে পারছে না, এমন কি সুগ্রীব জাম্বুবান, যারা বিশ্বভুবনের খবর রাখে, তারাও না! সীতার সন্ধানে সুগ্রীব পৃথিবীর সমস্ত দিকে তার বানর সেনা পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত সম্পাতির মুখে রাবণের ঠিকানা জেনে নিয়ে হনুমান সীতার খোঁজ নিয়ে এলেন। কিন্তু খানিকটা পরেই আমরা জানতে পারছি—সুগ্রীবের সঙ্গে রাবণের বেশ চেনা-পরিচয় ছিল। রাবণ একবার কিষ্কিন্ধ্যায় এসে একমাসের জন্য স্টেট গেস্ট হিসেবে থেকে গিয়েছিলেন। অতবড়ো একজন রাজ-অতিথির দেশের কথা যুবরাজ সুগ্রীব জানবেন না, তা হতেই পারে না। তাহলে রামকে তো তিনি প্রথমেই লঙ্কার খবর বলে দিলে পারতেন! অবশ্য, রামায়ণের সবটুকুই বাল্মীকির রচনা কিনা সে সম্পর্কে সংশয় আছে। অনেকেই বলেন, উত্তরকাণ্ডের অনেকগুলি সর্গ প্রক্ষিপ্ত।

একটি মেয়ের নাম অনিতা। আমি জিজ্ঞেস করলুম, নামের বানান কি লেখো, হ্রস্ব-ই না দীর্ঘ ঈ? মেয়েটি বলল, বাঃ, ন-এ দীর্ঘ-ঈ! তাছাড়া আবার হয় না কি!

আমি বললুম, হ্রস্ব-ই দিয়েও লিখতে পারো, কোনো ক্ষতি হবে না। নামের বানান তো—

মেয়েটি আমাকে মহামূর্খ মনে করে বলল—নাম তো কি হয়েছে, বাংলা

নামের বুঝি একটা মানে থাকবে না?

আমি মেয়েটিকে বোঝাতেই পারলুম না যে, অনিতা কোনো বাংলা বা সংস্কৃত নাম নয়। মেমসাহেবদের নাম থেকে নকল করা। বাংলায় অনিত অনিতার এরকম মানে করা যায় বটে, কিন্তু সেই মানেটা জানলে কোনো বাবা-মা মেয়ের ওরকম নাম রাখতেন না। আশ্চর্যের বিষয়, মেয়েটির একুশ বছর বয়েস, অথচ এ পর্যন্ত তাকে কেউ ঐ ভুলটা ধরিয়ে দেয়নি। আমি তাকে হাসতে হাসতে বললুম, এখনই অত মানে বোঝার দরকার কি। আগে পরিণীতা হও তখন সব মানে বুঝবে!

ইংরেজিতে একটা ভুল অনেকদিন থেকে চলে আসছে। অনেক সরকারি চিঠির বয়ান এইরকম থাকে, 'এ লেটার ওয়াজ সেন্ট টু ইউ আণ্ডার দি সিগনেচার অফ...' এর আক্ষরিক অনুবাদ 'অমুকের সই-এর তলায় লেখা একটা চিঠি তোমায় পাঠানো হয়েছিল।' কিন্তু আসলে, সই-এর তলায় তো চিঠি থাকে না, চিঠির তলাতেই তো সই থাকে। তবে? শোনা যায়, রাজা প্রথম জেমস নাকি অহংকারবশত চিঠির নীচে নাম সই না করে চিঠির ওপর সই করতেন। তখন কথাটা চালু হযেছিল, এখনো সেই ভুল চলছে।

প্রসঙ্গত এইরকম আর একটা ভুলেব কথা মনে পড়ল। আমেরিকায় ফুটবল খুব জনপ্রিয় খেলা। লোকে এরোপ্লেনে চেপে ফুটবল খেলা দেখতে আসে। সেই ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা অর্থাৎ ইংরিজি ফুটবল খেলার কোনোই মিল নেই! আমেরিকান ফুটবল খেলায় পায়ের কোনো ব্যবহারই নেই, হাতে করে ডাবের মতন দেখতে বল নিয়ে ছোটাছুটি, ঘুঁষোঘুঁষি, মারামারি চলে। আমি একটি আমেরিকানকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমবা ঐ খেলাটিকে ফুটবল নাম দিয়েছ কেন? প্রথমত বল জিনিসটা গোল হওয়ার কথা, তোমাদেরটা চ্যাপ্টা—আর পা দিয়ে সট মারার কোনো ব্যাপারই নেই—তবু ওটা ফুটবল খেলা হয় কি করে? সে মহা অবাক হয়ে বলল, ফুটবল খেলা হচ্ছে ফুটবল খেলা, এর আবার হওয়া না হওয়ার কি আছে?

ব্যবহারের ভুল অনেক সময়ই নজরে পড়ে এবং বেশ মজা লাগে। ট্রামে বাসে প্রায় সময়ই অন্য একটা লোককে কণ্ডাক্টর বলে ভুল হয। এবং তাকেই বলতে ইচ্ছে হয়—বেলটা দিন তো। এরকম মনে করার প্রতিফলও আমি পেয়েছিলুম। একবার একটা চায়ের দোকানে একা একটা চেয়ারে বসে আমি চা খাচ্ছিলুম—চা শেষ হবার পরও বসেছিলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ দু'জন ভদ্রলোক মহিলা-ক্যাবিন থেকে খেয়ে বেরিয়ে এসে আমার টেবিলে এসে বললেন, অনেকক্ষণ থেকে বেয়ারকে ডাকছি, আসছে না। কত হয়েছে আমাদের! পয়সাটা রাখুন! শেষকালে এতকাণ্ড করার পর আমাকে ওরা রেস্টুর‍্যাণ্টের ম্যানেজার

ভাবল ? তাহলে তো, এরপর কোনোদিন যে কেউ আমাকে কুস্তি প্রতিযোগিতার রেফারিও ভাবতে পারে! কিছুই আশ্চর্য নয়। পরিচিত অল্প-পরিচিতদের নাম ভুলে যাওয়াও অনেকের ব্যাধি। আমি একজন লোককে চিনি তার সঙ্গে যতবারই আমার পথে দেখা হয়েছে, তিনি সাড়ম্বরে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন, এবং পাশে কেউ থাকলে তাঁকে আমার সম্পর্কে বলেছে আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আমার খুব বন্ধু ইয়ে, হ্যাঁ, কি যেন আপনার নামটা ? এই নাম ভুলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত যিনি, তাঁকেও আমি চিনি। তিনি অত্যন্ত পত্নী অনুগত-প্রাণ, বিয়ে হয়েছে আড়াই বছর, কিন্তু প্রায়ই বউয়ের নাম ভুলে যান। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমে জিজ্ঞেস করে যান, হ্যারে আমার বউয়ের নামটা যেন কি ? আজকাল তিনি বউয়ের নাম একটা কাগজে লিখে মানিব্যাগে রেখে দিয়েছেন। কখনো ডাকার দরকার হলে লুকিয়ে দেখে নেন।

আমি নিজেও একবার একটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। কেন যে ওরকম ভুল হলো, আজ পর্যন্ত তার কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পাইনি। ছেলেবেলায় গ্রে স্ট্রিটের একটা বাড়িতে আমরা কয়েক বছর ছিলাম। বাড়িটা এমন কিছু ভালো নয়, কোনো বিশেষ মধুর স্মৃতিও নেই। সেই বাড়ি ছাড়ার এগারো বছর বাদে, তখন আমি গ্রে স্ট্রিট থেকে অনেক দূরে থাকি, কিন্তু সন্ধেবেলা সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে বাস থেকে নেমে পড়লাম গ্রে স্ট্রিটে। তারপর স্বপ্নচালিতের মতো হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়িটাব কাছে এসে, সোজা ভেতরে ঢুকে দোতলায় উঠে—যে ঘরে আমি থাকতাম, সেই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলাম, মা, মা, দরজা বন্ধ কেন ? খোলো—

এগারো বছরে সেই বাড়ির অনেক বদল হয়েছে, অন্য ভাড়াটেরাও বদলে গেছে, আমায় কেউ চেনে না। তখনও আমার ভুলটা খেয়াল হয়নি, আমি আর একবার ধাক্কা দিতেই একজন তরুণী মহিলা দরজা খুলে বললেন, কাকে চাই! তখন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। কেঁপে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। আমি নিরুত্তর। ঘর থেকে আর একজন পুরুষ বেরিয়ে এসে আমার আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাকে চান ? আমি বিড়বিড় করে কোনো রকমে বললুম, এ বাড়িতে অপূর্ব ব্যানার্জি থাকেন না ? তাহলে বোধহয় আমার ভুল হয়েছে! আমি তখন ছুটে পালাতে পারলে বাঁচি। ভদ্রলোক বললেন, না অপূর্ব ব্যানার্জি বলে কেউ এ পাড়ায় থাকেন না। একেবারে দোতলায় উঠে এসেছেন — আমি বললুম, আমায় মাপ করুন, আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি—লোকটি কৌতূহলী হয়ে তবুও জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মা মা বলে ডাকছিলেন দরজা ধাক্কা দিয়ে—

জানি পুরুষের অনুরোধে ধরণী দ্বিধা হয় না। কোনো রকমে চোখেমুখে হাসি ফুটিয়ে বললুম, না, না আমি তো মা বলে ডাকিনি, তা কেন ডাকতে যাব, আপনি ভুল শুনেছেন, আমি মামা বলে ডাকছিলুম। অপূর্ব ব্যানার্জি আমার মামা হন। আচ্ছা চলি।

২৪

জামাটা পিঁজে গেছে, কলারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আঁশ, কাঁধের পাশে সামান্য ফাটতে শুরু করেছে, ডান হাতের কনুইয়ের কাছটায় একবার সেলাই করা, তবু জামাটা ফেলতে মায়া হয়। নীল-সাদায় ডোরাকাটা আমার জামাটার বয়েস পাঁচ বছর পূর্ণ হলো, এবার ওকে তোরঙ্গের নীচে নির্বাসন দেবার কথা কিংবা আগামী বছরের দোল খেলার জন্য জমিয়ে রাখা, কিংবা বাসনওয়ালীদের রুক্ষ হাতে সমর্পণ করলেও হয়, কিন্তু কিছুতেই জামাটাকে বিদায় দিতে আমার ইচ্ছে করে না, নরম মোলায়েম স্পর্শ দিয়ে সে আমাব শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। ডায়িং ক্লিনিং-এ পাঠালে পাছে ওর সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তাই আমি ওকে নিজেই সাবধানে বাড়িতে কেচে নিই। এখন শীতকালে কোট বা সোয়েটারের নীচে পরলে ওর ছেঁড়া অংশ আর তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু বুকের কাছাকাছি থাকে।

জামাটাকে বিসর্জন দেওয়া মানেই তো কত স্মৃতি নষ্ট করা। অনেক জামা-কাপড়ের মধ্যে কোনো একটার প্রতিই অনেক সময় বেশি মায়া পড়ে, গত পাচ বছরে আমার কত জামা ছিঁড়ল, হারাল—কিন্তু এই নীল-সাদার ডোরাকাটা জামাটাই আমার প্রাণের বন্ধু।

মনে পড়ে, পাঁচ বছর আগে নতুন এই জামাটা কিনে দুমকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রামপুরহাট থেকে বাসে যাবার পথে প্রথম শীতের অবসন্ন আলোর সন্ধ্যায় কোনো একটা কারণে হঠাৎ আমার খুব মন খাবাপ হয়ে যাবার পর চোখে পড়েছিল ছোটখাটো দু-চারটে পাহাড়, অবোলা জন্তুর মতন রাস্তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি হিমালয় অভিযাত্রী সংঘের সদস্য কোনোদিনই হবো না। কিন্তু প্রায়ই আমার কোনো পাহাড় চূড়ায় উঠতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কোনো পাহাড়ের শিখরে একা উঠে উড়িয়ে দিই আমার নিজস্ব পতাকা। সেদিন হাতের কাছেই অতগুলো চমৎকার শান্তশিষ্ট পাহাড় দেখে আমার খুব লোভ হচ্ছিল। এই নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটাকে আমি সেদিন পতাকা করে উড়িয়েছিলাম।

সেই বাসে চারজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী ছিল। কি ঝকঝকে কথা,

আর খুনসুটি হাসি তাদের, কার না ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে একটু ভাব জমাতে, সংক্ষিপ্ত প্রবাসের দিনগুলো রঙ্গরসে ভরাতে। কিন্তু আমি হেরে গেলুম, যেমন অনেক খেলাতেই হেরে যাই। বাস ছাড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটি মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল, আমি শশব্যস্তে সেটা তুলে দিয়ে ভূমিকা পর্যন্ত সেরে রেখেছিলুম। মেয়েটি আমার দিকে মৃদ হেসে বলেছিল, ধন্যবাদ। আরো আড়াই ঘণ্টা এক সঙ্গে যেতে হবে—মাঝপথে ওদের জন্য চা এনে দিয়ে কিংবা অন্য কোনো ছলে ওদের সঙ্গে আলাপ জমাবার পরিকল্পনায় মশগুল ছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। মেয়ে চারটি তাদের কাচ ভাঙা কণ্ঠস্বরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, লেকে সাঁতারের ক্লাব, নিউ মার্কেট, কোন কোন চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়মিত দেখা যায়—এই সব আলোচনায় বিভোর হয়েছিল। আমি মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলুম, ওদের মুখের রেখায়, হাসির ভঙ্গি, শাড়ির ভাঁজ —এবং মেয়েদের আরো যা-যা দেখার শুধু তাই দেখছিলুম, তখন জানলার বাইরে তাকাইনি, পাহাড় কিংবা জঙ্গল দেখিনি, প্রকৃতি দেখার সময় ছিল না। চোখের সামনে জ্যান্ত প্রকৃতি থাকতে কে আর বন-জঙ্গল দেখতে চায়। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন তার কানের কাছে কব্জি তুলে বলল, ইস, ঘড়িটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। অনুরাধা, তোর ঘড়িতে কটা বাজে রে?

চারটি মেয়েরই হাতে ছোট জুলজুলে ঘড়ি, কিন্তু দেখা গেল চারজনের ঘড়িতে চাররকম সময়। তাই তো স্বাভাবিক। ওরা তন্বী, ওরা যুবতী ও সৌভাগ্যবতী —ওরা চারজনই আলাদা আলাদা সময় ভোগ করবে—তাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ওরা সঠিক সময় জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা সময় নিয়ে কলহ করে কালক্ষয় করতে লাগল। অনুরাধার ধারণা তার ঘড়িটাই ঠিক কিন্তু রুচিরা বলছে তার ঘড়ি রেডিও মেলানো। পারমি তার দৃঢ় বিশ্বাস তার ঘড়ি কখনো এক সেকেণ্ডও স্লো-ফাস্ট হয় না—আর দময়ন্তীর ঘড়ি তো থেমেই আছে—ধুকধুক শব্দও নেই। মোটমাট ওদের পরস্পরের ঘড়িতে পাঁচ থেকে আধঘণ্টা সময়ের তফাৎ। শেষ পর্যন্ত কার ঘড়িতে ঠিক সময়—তা জানার জন্য পরস্পরের মধ্যে বাজি রাখল। রুচিরা বলল, অন্য কারুর ঘড়িতে দ্যাখ তাহলে কটা বাজে?

মেয়েদের সবচেয়ে কাছের সীটে আমি বসে আছি। আমার ফুলহাতা নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটায় কব্জি পর্যন্ত বোতাম আঁটা। ওরা আমার দিকে আলতোভাবে তাকিয়ে পরোক্ষে প্রশ্ন করল, কটা বাজে? কিন্তু আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই, আমি ঘড়ি হাতে দিই না। সময়কে অত নিখুতভাবে জানার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আলোর যেমন সাতটা রং, সেইরকম ভোর, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে, রাত্রি, গভীর রাত্রি—এই সাতটা বেলা আমি খালি চোখে দেখতে পাই—এতেই

আমার কাজ চলে যায়। কিন্তু মেয়েগুলোর সঙ্গে আলাপ করার এই তো সুযোগ। ঘড়ি নেই শুনলে ওরা কি আর আমায় পাত্তা দেবে? আমার বেশভূষা দেখে ওরা ধরেই নিয়েছে—আমার যখন চোখ কান সবই ঠিক আছে—তখন হাতে ঘড়িও আছে—তাই তো থাকে। সুতরাং আমি স্মার্ট হবার জন্য বললুম, আপনাদের ঘড়ির সময়গুলো যোগ করে চার দিয়ে ভাগ দিন—তাহলেই ঠিক সময় পেয়ে যাবেন।

মেয়েদের কোনো উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই আমার পাশের ব্যাচ থেকে একজন যুবা বলে উঠল—এখন ঠিক চারটে বেজে সাতচল্লিশ। যুবকটি আস্তিন গোটানো কবজি উঁচু করে ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরেছে—ঘড়িটার চেহারাই এমন ইম্প্রেসিভ যে, দেখলেই মনে হয়—ওরকম ঘড়ি ভুল সময় দিতে পারে না। যুবকটি তবুও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, কী রে বরুণ তোর ঘড়িতে কটা বাজে? সঙ্গী উত্তর দিল ঠিক, ঐ চারটে বেজে সাতচল্লিশই। রুচিরা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, দেখলি বলেছিলুম না, আমারটাই—

যুবক দুজনের নিখুত পোশাক, চুল ও জুতো সমান ঝকঝকে এবং ওদের হাতে সঠিক সময়। ওরাই জিতে গেল। যুবক দুজনের একজন ঐ মেয়েদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, আপনি কি প্রশান্তর বোন? সেই মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত মুখে বলল, হ্যাঁ, আপনি আমার দাদাকে চেনেন বুঝি? যুবকটি বলল হ্যাঁ, চিনি মানে—আপনার দাদার এক বন্ধু আমারও খুব বন্ধু, সেই হিসেবে একবার... আমার বন্ধুর নাম সিদ্ধার্থ মিত্র। রুচিরা বলে উঠল, ও, সিদ্ধার্থদা? হ্যাঁ হ্যাঁ—

সব মিলে যাচ্ছে। এরপর আর কথার অভাব হয় না—যুবক দুটির সঙ্গে মেয়ে চারটি প্রচুর ভাব বিনিময় করতে লাগল। আমি একেবারে হেরে গেলুম। আমার দিকে ওরা ফিরেও চাইল না। বিষণ্ণ মুখে আমি প্রকৃতি দেখা শুরু করলুম জানলা দিয়ে।

সূর্য সবে ডুবছে। ডিমের কুসুম মতো লাল একদিকের আকাশ। চওড়া পথে শুধু আমাদের বাসটা একমাত্র ছুটছে, মাঝে মাঝে ধাবমান গাছ, দূরে কাছে দু-একটা টিলা। মন খারাপ হলেই প্রকৃতিকে বেশি ভালো লাগে সন্দেহ নেই। মেয়ে চারটিকে ক্রমশ আমার অসহ্য লাগল—মনে হলো হাল্কা, প্রগলভা, ফচকে মেয়ে সব—সময়ের মর্ম বোঝে না—তবুও হাতে ঘড়ি পরা চাই। আমি ক্রমশই পথের পাশের নীরব দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলুম।

বাস থামল এক জায়গায়। চা খেতে নেমে আমি কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলুম এরপর আরো বাস আছে? সে বললে অনেক অনেক। সেই বাসটা যখন আবার ছাড়ল—আমি আর তাতে উঠলুম না।

আস্তে আস্তে পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে হাঁটতে লাগলুম। লাল কাঁকর মেশানো জমি, সজনে আর মহুয়া গাছ এদিক ওদিক ছড়ানো। নির্জনতা এখানে গগনস্পর্শী। কাছেই একটা খুব ছোট্ট পাহাড়। পাহাড় নয়, টিলা কিংবা ঢিবিও বলা যায়—আমি সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মনের ভেতরটা বিষম ভারী, বিষণ্ণতা আর অভিমান চাপ বেঁধে আছে। সেই নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে মনে হলো যেন সারা জীবনটাই বঞ্চিত হয়ে গেছি। অথচ কি জন্য? বাসের মধ্যে চারটি ঝকঝকে মেয়ে আমার সঙ্গে কথা না বলে অপর দুজনের সঙ্গে কথা বলেছে, সেইজন্য? অসম্ভব অবাস্তব এই বিষণ্ণতা —সামান্য একটা জিনিসও না পেলে—সারা জীবনের সমস্ত না-পাওয়া দুঃখ এসে ভিড় করে।

টিলাটার পাথরগুলো খাড়া এবং মসৃণ একটাও গাছ বা লতা নেই। কিন্তু খাঁজ রয়েছে অনেক, বেশি উঁচুও নয়। একবার সামান্য পা পিছলে ধাক্কা খেতেই ধারাল পাথরের খোঁচায় কনুইয়ের কাছে জামাটা ছিঁড়ে গেল। ইস, নতুন জামা! আমার প্রিয় নীল-সাদা ডোরাকাটা জামা। আর একটা দুঃখ বাড়ল। যুক্তিসঙ্গত ভাবে পর্যাপ্তভাবে আজ আমার মন খারাপ করার সময়।

কিন্তু টিলাটার ওপব যখন উঠে দাড়ালুম, সব বদলে গেল। বুকের মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা আছে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিঃসঙ্গতা এত বিশাল যে তার রূপ অন্যরকম। টিলার ওপর দাড়িযে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, সাঁওতাল পরগণার আকাশ ও প্রান্তর। দূরের গ্রামে দু-চারটি ফুটকি ফুটকি আলো—এছাড়া পাতলা জল-মেশানো ছাই রঙে ভরে গেছে দশদিক। টিলার ওপর আমি একা দাঁড়িয়ে —কিন্তু একটুও নিঃসঙ্গ মনে হলো না। মনে হলো এই পাহাড়, এই আকাশ ও ভবিষ্যৎ—এই বুনো ঝিঁঝির ডাক ও হাওয়ার খেলা—এ সবই যেন আমার। আমি এদের সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারি। আমি জীবনে অনেক খেলায় হেরে গেছি —কিন্তু আমি একটা পাহাড় জয় করেছি। এই পাহাড় চূড়ায় আমার পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে। পকেটে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই, আমি তখন আমার নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটা খুলে পতাকার মতন উড়িয়ে আপন মনে বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা বড়ো মধুর। যে-যাই বলুক, নানান দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে বড়ো আনন্দেই বেঁচে আছি। হে সময়, আমাকে আর একটু সময় দাও।

২৫

মাকড়সাটাকে আমি একটা টোকা মারলুম, ওটা মাটিতে পড়ল না, শূন্যে ঝুলতে

লাগল। তারপর, ওটা আবার আস্তে আস্তে ওর অদৃশ্য সুতো বেয়ে টেবিলের দিকে, আমার দিকেই ওঠার চেষ্টা করল। আমি বললুম, আবার ? যা, পালা! কিন্তু পালাবে কোথায় ? মাটিতে নামতে ভয় পাচ্ছে, হয়তো ভাবছে, মাটিতে নামলেই আমি ওকে জুতো দিয়ে থেঁৎলে দেব।

আমি নীচু হয়ে আস্তে আস্তে ফুঁ দিলুম। তখন আর ও উঠতে পারে না, টার্জানের মতো দুলতে লাগল। পাশুলিকে গুটিয়ে এনেছে বুকেব কাছে, মুখখানা অবিকল এক বুড়ো মানুষের মতন, একটু কুটিল কুটিল। শীতকালে গ্রামের বুড়োরা যে-রকম ঠ্যাং গুটিয়ে বসে, সেইরকম চেহারা। হাওয়ার মধ্যে হাত চালিয়ে ওর সুতোটা ধরে ফেললুম, ওকে কাছে এনে মুখখানা আরো একটু ভালো করে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোন ফাঁকে টেবিলের পায়ার সঙ্গে ছুঁয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ওটা টেবিলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন উকি মেরে দেখি, টেবিলের তলাটায় বিশাল মাকড়সার জাল পাতা, একেবারে জঙ্গলের মতন।

বাড়িতে ঝুলঝাড়া নেই। টেবিলের তলায় মাকড়সার জাল রাখা ঠিক না, টেবিলের নীচে পা রাখতে অস্বস্তি লাগবে সব সময়। মাকড়সা চেটে দিলে নাকি গরল হয়, মাকড়সার জাল আমার হাতে বা গায় লাগলে অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। সেটা তখন ওর জালের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে জুলজুল করে আমার দিকে চেয়ে আছে। এক মুহূর্তে আমি ওর পাতানো সংসার লণ্ডভণ্ড কবে দিতে পারি। কিন্তু হাতের কাছে কিছু পাচ্ছি না। সেই সময় হঠাৎ এক বন্ধু আমায় ডাকতে এল। আমি টেবিলের তলায় সেঁধিয়ে বসে আছি দেখলে বন্ধুটি অবাক হয়ে যাবে —তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাত-টাত ঝেড়ে নিলুম। মাকড়সাটার কথা ভুলে গেলুম পরমুহূর্তে।

দিন কয়েক পরে আমি একটা অফিসে গিয়েছিলুম কোনো একটা কাজে। অফিসগুলোতে যা হয়, প্রথম যে লোকটিব কাছে আমি আমাব প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করলুম, তিনি বললেন, আপনি ঐ কোটপরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলুন। কোটপরা ভদ্রলোক আমার কথা আদ্দেক শুনেই বলে উঠলেন, এ তো আমার ডিপার্টমেণ্টের নয়, আপনি পরেশবাবুর কাছে যান।

বিশাল লম্বা হলঘরের মতন অফিস, গোটা পঁচিশেক টেবিল পাতা, এর মধ্যে কোন টেবিলের অধিকারীর নাম পরেশবাবু তা আমার জানার কথা নয়। বাধ্য হয়েই সে কথা আমায় প্রকাশ করতে হলো। কোটপরা ভদ্রলোক, একেবারে পিছন ফিরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে পরেশবাবু। সেই পরেশবাবুর কাছে এসে শুনলুম, তিনি ঠিক পরেশবাবু নন, পরেশবাবু আসলে ছুটিতে—তিনি পরেশবাবুর জায়গায় বসে কাজ করছেন যদিও, কিন্তু তাঁর কাজ করছেন না—করছেন নিজের কাজ,

সে কাজের জন্য যেতে হবে মিস্ গাঙ্গুলির কাছে, যদিও তিনি, অর্থাৎ মিস গাঙ্গুলি, এখন সীটে নেই।

এরপরও যদি আমি রাগ করি, তবুও লোকে আমায় বলবে রগচটা। আমি চেঁচিয়ে বললুম, ওসব মামদোবাজি ছাড়ুন তো, আপনাদের মালিক কিংবা বড়োসাহেব কোন ঘরে বসে বলুন, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

বড়োসাহেব বসেন একেবারে ভেতরের দিকের এয়ারকণ্ডিসন ঘরে, গদি-মোড়া চেয়ারে তিনি আসীন। প্রথমে মিনিট পাঁচেক তিনি আমার সঙ্গে কথাই বললেন না, টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন দার্জিলিং-এ পটলের দাম বেশি কেন সেই বিষয়ে গল্প করতে লাগলেন। তারপর অতিকষ্টে চোখ তুলে বললেন, কি ব্যাপার ? আমি জানালুম। তিনি বললেন, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমার কাছে কেন ? মেঘেন্দ্রবাবুর কাছে যান।

আমি বললুম, উঁহু, আর কোনো বাবুটাবু নয়, আমি খোদ বড়োবাবুর সামনে বসে কাজ চাই! আমি টেবিলে টেবিলে ঠোক্কর খাব, আর আপনি এখানে বসে বসে আলু-পটলের গল্প করবেন—

তারপর আর কি, কথা কাটাকাটি থেকে টেবিল চাপড়ানো, চেঁচামেচি, বড়ো সাহেব ঘন ঘন বেল বাজাতে লাগলেন, তিনজন লোক এসে হাজির হলো, শেষ পর্যন্ত প্রায় এমন অবস্থা যে, আমাকে বোধহয় দারোয়ান দিয়ে বার করে দেবেন। তা যদি হয়ই, তবে আগে একটা কিছু লণ্ডভণ্ড করে যেতে হবে, আমি ভাবছি এই কথা।

ঠিক সেইমুহূর্তে হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমার রাগ কোথায় উবে গেল। ঐ রকম অবস্থাতেও আমি একটু মুচকি হেসে ফেললুম। বাগারাগির মাঝখানে আমি হাসছি দেখে, থেমে গিয়ে ভুরু দুটি কুঁচকে গভীর বিস্ময়ে বড়োসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাতে মিলটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমি আবার হেসে ফেললুম। বড়োসাহেবকে অবিকল সেই মাকড়সাটার মতন দেখতে। সুট-টাই পরে থাকলে কি হয়, সেইরকম হুবহু কোঁচকানো মুখ, সেইরকম জুলজুলে চোখ। কী রকম জাল পেতে বসে আছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

আমি আর কোনো কথা না বলে, তৎক্ষণাৎ সেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লুম। নিউ মার্কেট থেকে একটা ঝুলঝাড়া কিনে সেই দণ্ডেই সোজা ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরে এসে, দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই প্রত্যেকটা মাকড়সার জাল ভাঙতে শুরু করলুম। টেবিলের তলায় উঁকি মেরে দেখি, হ্যাঁ, বড়োসাহেব ঠিক বসে আছে। চালালুম ঝুলঝাড়া। নিমেষে তার বাড়িঘর, সম্পত্তি, অফিস সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মাকড়সাটা প্রথমে পালায়নি, টুপ করে খসে পড়ল মাটিতে,

আজ আর অদৃশ্য সুতো ছড়ায়নি, হয়তো হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বলেই মাটিতে পড়েও চুপ করে রইল। আগের দিনই আমি ওকে মারতে পারতুম, কিন্তু মারিনি বলে ও বোধহয় ভাবছিল আমি আজও ওকে দয়া করব। কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হাস্যে বললুম, ইস, দয়া ? তখন মনে ছিল না ? আমি থেৎলে মারার জন্য পা চালালাম, মাকড়সাটা ঠিক তখনই দৌড় লাগাল, ওর একটা পা আমার জুতোর কোনায় চাপা পড়েছিল, সেই পা-টা ছিড়েই পড়ে রইল, মাকড়সাটা দৌড়ে পালাল।

আমি পিঁপড়ের সমাজের হিটলার, পিঁপড়েদের জাত ধ্বংস করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। যেখানে সেখানে লালপিঁপড়ে দেখলেই আমি ক্ষেপে উঠি। আগে পিঁপড়েদের আমার ভালোই লাগত। ওদেব নিয়ম শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় প্রভৃতি আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতুম। কিন্তু, একদিন আমার চিরুনিতে এক গাদা পিঁপড়ে লেগে ছিল, না দেখে সেটা ব্যবহার কবায়—আমার চুলের জঙ্গলে পিঁপড়ে ছড়িয়ে যায় —এবং সারাদিন ধরে আমায় কুটুস কুটুস কবে কামড়াতে থাকে। তার পরদিন থেকে রোজই দেখি, আমার চিরুনিতে পিঁপড়ে জমে, পিঁপড়েরা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, কিন্তু আমার মাথার মধ্যে তো কোনো মিষ্টি ব্যাপার নেই, নিছক ঝাঁঝে ভর্তি, পিঁপড়েরা সেখানে কি চায় ? পিপড়েদের এই অনধিকার চর্চা চলতেই থাকে, আমিও তাদের ধ্বংস কবার জন্য ক্ষেপে উঠি। অনেক সময় একটা বা দুটো পিঁপড়ে দেখলে আমি তাদের পিছন পিছন গুঁড়ি মেরে যাই—তাদের বাসার সন্ধানে, সেখানে সব কটাকে একসঙ্গে মারবাব জন্য। কোথাও কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হবার পর যদি একটা পিঁপড়ের সঙ্গেও দেখা হয়, তবে আমি মেয়েটির চেয়ে পিঁপড়ের দিকেই বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ি।

কিন্তু মাকড়সার বিষয়ে আমার অমন জাতক্রোধ জন্মে যায়নি। সেদিন ঐ বড়োসাহেব মার্কা মাকড়সাটাকে শাস্তি দেবার পর, আর আমি ওদের কথা ভাবিনি। বিশেষত ঐ কাণ্ডের দুদিন পরই আমি সেই অফিসটা থেকে একখানা রেজিস্ট্রি করা চিঠি পেলাম। আমি যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম, তার জন্য আর দ্বিতীয়বার যেতেই হলো না, ওবাই তৎপর হয়ে আমাকে সবকিছু বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভয় দেখানোতে তো কাজ হয়েছে বেশ।

সুতরাং দিন সাতেক বাদে আমি বারান্দার কোণ জুড়ে যখন আবাব মাকড়সার জালের সমারোহ দেখতে পেলাম—তখন আমার মনের অবস্থটা বড়ো বিচিত্র। ঝুলঝাড়াটাকে আমি বারান্দার কোণে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, সেটাকে ঘিরেও নতুন জাল পাতা হয়েছে। এবং বড়োসাহেব মার্কা মাকড়সাটা নির্ভুলভাবে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে। চিনতে আমার ভুল হয়নি, চার্লি চ্যাপলিন মশা চিনতে পারেন, আর আমি মাকড়সা চিনতে পারব না ? তাছাড়া, ওর একটা পা কম। আমাকে

দেখেই ও পালাবার চেষ্টা করল, এতে আমি বেশ খুশি হয়ে পড়লুম। তাহলে এবার টিট হয়েছে।

ওর সমস্ত বাড়িঘর সম্পত্তি আমি নষ্ট করেছিলুম—তারপর আবার ও নতুন করে এমন সব বানিয়েছে যে একে উচিত বাঙালি রিফিউজিদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা। ও অনেক নতুন ভাড়াটেও বসিয়েছে—কিংবা এরই মধ্যে ওর নিজেরই বংশবৃদ্ধি হয়েছে (বস্তুত, বড়োসাহেবের মতন মুখ হলেও ও যে মেয়ে মাকড়সা নয় তা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি না।) এ-কোণে সে-কোণে আরো পাঁচ-সাতটি মাকড়সা বসে আছে। আমি খুব কাছে গিয়ে ওদের ভালো করে নজর করে দেখতে লাগলুম, ওরা চুপচাপ আমাকে দেখছে সন্দেহ কি, চেষ্টা করলে প্রত্যেক মাকড়সার মধ্যেই মানুষের মুখের আদল খুঁজে পাওয়া যায়। আলাদা ধরনের মানুষ।

আমি সেই জালটা আর ভাঙিনি। ওরা সেখানেই আছে—এমনকি, ছোটখাটো কোনো পোকা বা মাছি আমার কাছাকাছি এলে—আমি সেগুলোকে আধমরা করে সেই মাকড়সার জালে ফেলে দিয়ে আসি। আমি ওদের পুষছি। আবার কখনো কোনো অফিস-টফিসে খারাপ ব্যবহার করলে—বাড়িতে ফিরে প্রতিশোধ নিতে হবে তো।

২৬

একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পাঁচজন ডাক্তার ছিলেন। সাজানো শামিয়ানার নীচে চেয়ারগুলোতে বসা মানুষগুলো সবাই সুসজ্জিত, ফুল ও গোলাপজলের গন্ধ ম' ম' করছে, বাচ্চা ছেলেদের হুড়াহুড়ি, কুমারী মেয়েদের তীক্ষ্ণ হাসি, রেকর্ডে সানাইয়ের সুর মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে। সেকেণ্ড ব্যাচ এই মাত্র খেতে বসল, এখন আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে পরে ব্যাচের জন্য। বরের সঙ্গে মুচকি হাসি বিনিময় এবং সাতপুরুষের বাঁধা রসিকতা হয়ে গেছে উপহার দেবার সময় কনের চেয়েও কনের পাশে বসে থাকা অন্য মেয়েদের মুখ দেখা হয়ে গেছে ভালোভাবে, এখন শুধু অপেক্ষা। আমি চুপচাপ বসে ছিলুম, বুঝতে পারলুম আমার পাশের পাঁচজন লোকই ডাক্তার।

বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। এক পেশার লোকরা যেখানেই একসঙ্গে মেলে, সেখানেই পেশাদারী কথা। উৎসবে, আনন্দে, শোকে, শোকযাত্রায়, রাজদ্বারে শ্মশানে—যেখানেই এক পেশার দু'জন লোকের দেখা হলো, সেখানেই

শুরু হবে, ইংরেজিতে যাকে বলে, 'শপ টক'। দু'জন কেরানিতে দেখা হলেই বড়োসাহেব কিংবা ডি এ ইনক্রিমেন্ট, দু'জন ব্যবসায়ীতে দেখা হলেই মন্দা বাজার, দু'জন ইঞ্জিনিয়ারের দেখা বিলেতে চাকরির সুখসুবিধে প্রসঙ্গে। (এক মাত্র সাহিত্যিকদের দেখেছি, পরস্পর দেখা হলে সাহিত্য সম্পর্কে একটিও কথা না বলে, বরং গোপন করে, অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।) যাই হোক, আমার পাশে বসে থাকা একজন কোঁচানো ধুতিপরা ফুলবাবু—যাকে দেখলে অনায়াসে সেতারবাদক বলে মনে হতে পারে, তিনি হঠাৎ তাঁর পাশের টুইলের স্যুট পরা দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে বললেন, মুখার্জি তোমার সেই হেপাটাইটিসের পেসেন্টটা মারা গেছে? টুইডের স্যুট উত্তর দিলেন, না তার হঠাৎ গল ব্লাডার ফেটে—। পাশের ফ্লানেলের স্যুট বললেন, আমার সেই মাড়োয়ারী রুগীটা ছিল না, তার হঠাৎ কান দিয়ে এমন রক্ত বেরুতে লাগল গলগল করে, একসঙ্গে দেড় পাউণ্ড দু'পাউণ্ড রক্ত।

পাঁচজনেই সে আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন, বুঝলাম, পাচজনই উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার। কী সুন্দর অল্প শীতের সন্ধ্যা, ফটফট করছে জোৎস্না, সানাইয়ে ইমন-কল্যাণ বাজছে, রঙীন বসনা সুন্দরীরা সিল্কের শাড়িতে শপ শপ শপ করে ঘোরা-ফেরা করছে, এই সময় সেই পাঁচজন জীবনে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার রক্ত, থুতু, পেচ্ছাপ, বমি, থ্রম্বসিস, ক্যানসার—এই সব ভালো ভালো বিষয় নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়লেন। আমি অবশ্য এমন রুচিবাগিশ নই যে, সে জায়গা ছেড়ে উঠে যাব, বরং কান খাড়া করে ওদের আলোচনা শুনতে লাগলুম। ভালোই লাগতে লাগল, এইসব উৎসব-আনন্দের মধ্যেও বসে রোগ-শোক-মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা শুনলে বেশ বোঝা যায়, জীবনটাই তো মায়া।

ক্রমশ রোগ-রুগীর প্রসঙ্গ ছেড়ে উঠল ডাক্তারি পেশার প্রসঙ্গ। পাচজন ডাক্তারই দেখলুম, এ বিষয়ে একমত যে, ডাক্তারিতে আর আজকাল সুখ নেই। ওমুক হাসপাতালের চৌধুরী—দেখলেন তো কি করে আমার প্রমোশনটা আটকে দিলে। আরে ভাই মিকশ্চারের জন্য বেশি দাম না নিয়ে উপায় আছে? শুধু তো গরীবকে বাঁচলে চলবে না—নিজেকেও তো বাঁচতে হবে! আউটডোরের সব প্রেসক্রিপশানেই 'রিপোর্ট' না লিখে উপায় কি, একটা ভালো ওষুধ পাওয়া যায়? ফ্যামিলি প্ল্যানিং না কচু, আগে সরকারি অফিসারদেরই ফ্যামিলি প্ল্যানিং দরকার! —ওদের মধ্যে যার চেহারা সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দূর দূর, এর চেয়ে ইনজিনিয়ারিং পড়লে ঢের ভালো হতো!

শুনে আমি স্তম্ভিত। ছেলেবেলায় কত স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবো। হতে পারিনি বলে, সারা জীবন খেদ রয়ে গেল। ভেবেছিলাম, ডাক্তারিই সব জীবিকার সেরা,

কোনো ডাক্তারকে কখনো গরীব দেখিনি, আর ডাক্তারিতে সেই সঙ্গে একটা সেবা করার কিংবা পয়সা নিয়ে পরোপকার করার গোপন আনন্দও পাওয়া যায়। আর এইসব প্রতিষ্ঠিত ডাক্তাররা বলছেন, ডাক্তারির চেয়ে ইঞ্জিনিয়াররাই সুখী ? আমার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় খুব দুঃখিত বোধ করছিলুম, কিন্তু পরের ব্যাচে খাবার ডাক পড়তে, তখুনি সব ভুলে গেলাম।

আমার এক বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার, তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে আরো দু'জন ব্যক্তি বসা, তাঁরাও ইঞ্জিনিয়ার, বড়ো সরকারি চাকুরে! যথারীতি আমাকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা পেশাগত আলোচনা শুরু করলেন। স্পেয়ার পার্টস, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান—এই সব। কতক্ষণ আর নীরবে বসে থাকব, সুতরাং এক সময় আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের বেশ স্বাধীনতা আছে, সুখ আছে, তাই না ? ওঁরা তিনজনেই একেবারে রে-রে করে আমাকে তেড়ে উঠলেন। সুখ স্বাধীনতা—চালাকি পেয়েছ ? চাকরি নিয়ে কি ভুলই করেছি। যাঁদের আলাদা ফার্ম আছে...কিংবা আসল মজা তো কন্ট্রাকটারদের। দ্যাখো না, কাজ করব আমরা—অথচ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাররাই যেন সবজান্তা, পদে পদে তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে—আমরা প্রাণপণ খাটছি, অথচ সাপ্লায়াররা এমন সব বাজে মাল দিচ্ছে—তারপর কথার কথায় বিদেশী এক্সপার্ট। বিদেশ থেকে রামা-শ্যামা-যদু-মধু টেকনিশিয়ানদের নিয়ে আসছে, গায়ের চামড়া সাদা হলেই হলো, তাদের অধীনে আমাদের কাজ করতে হবে।

—এর চেয়ে ভাবছি, জার্মানিতে একটা চান্স পেয়েছি, সেখানেই চলে যাব।

—আমি তো ভাবছি চাকরি ছেড়ে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে লেকচারারের চাকরি নেব, তাতে অন্তত এমন কথায় কথায় ওপরঅলার কথা শুনতে হবে না।

—দূর দূর! এর চেয়ে বাবা বলেছিলেন ডাক্তারি পড়তে, তখন বাবার কথা শুনিনি, এখন দেখছি তাতেই অনেক ভালো হতো।

আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলুম। তারপর দেখতে লাগলুম সবারই অভিযোগ আছে। আজকাল ইস্কুল মাস্টাররা সবাই প্রায় এম. এ. পাশ, তাঁদের দুঃখ, কেন কলেজের অধ্যাপক হতে পারলেন না। তাঁদেরও তো একই যোগ্যতা ছিল। কলেজের অধ্যাপকদের দুঃখ, তাঁরা কেন আই. এ. এস. হতে পারলেন না। কিন্তু বাজে বাজে ছেলেও তো আই. এ. এস. হয়ে সুখে আছে—নেহাত তাঁদের বয়েস পেরিয়ে গেছে, তাই! এমনকি কত অগামার্কা ছেলেও ডবলু. বি. সি. এস. হয়ে হম্বিতম্বি দেখাচ্ছে, কত লোকের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছে। আই. এ. এস.-দের দুঃখ, এখনো ব্রিটিশ আমলের আই. সি. এস.-দেরই সম্মান এ দেশে, অথচ, এর চেয়ে কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সিটা পাশ করলেই—। উকিলের দুঃখ তিনি কেন

ব্যারিস্টার নন, ব্যারিস্টারের দুঃখ তিনি কেন ফিনান্স মিনিস্টার নন। বাজারে, তরকারিওয়ালার দুঃখ সে কেন মাংসওয়ালা নয়, মাংসওয়ালার দুঃখ সে কেন ফিলমস্টার নয়। এমনকি একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষকেও আক্ষেপ করতে শুনলুম, দূর দূর, এর চেয়ে মেয়ে হয়ে জন্মালেও ভালো হতো, তা হলে তবু ট্রামে-বসে অন্তত মাঝে মাঝেও বসার জায়গা পেতুম।

একদিন গঙ্গার পাড়ে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নৈশ নদীর শোভা দেখছিলাম। পাশেই ধুনী জ্বালিয়ে দুজন অল্পবয়সী সাধু। লাল ন্যাকড়া জড়ানো গাঁজার কল্কেতে টান দিতে দিতে, তারা মশগুল হয়ে কি যেন আলোচনা করছে। কান পেতে শুনলুম—আর মহারাজ, এ লাইনে আজকাল কোনো ফায়দা নেই। মানুষ একেবারে ধরম করম ভুলে যাচ্ছে। সাধুসন্ন্যাসীকে দান ধ্যান করে না। ভক্তি শ্রদ্ধাও করে না। সেদিন মোটর গাড়ি নিয়ে চারজন বাবু এলেন, এসে বলল, এ সাধু, গাঁজা সাজো। আরে, আমি কি তোর বাপের নোকর? কোথায় আমায় নিবেদন করবি, আমি প্রসাদ দেবো। তা না, আমায় হুকুম! একজন তো আমার ঠ্যাং ধরে ছড় ছড় করে টানতে লাগল—এমন হারামজাদা—।—যা বলেছ, কাল থেকে শুধু একটা বাঁধাকপি সেদ্ধ খেয়ে আছি। পেটে একদানা চাল পড়েনি। আমিও ভাবছি এ লাইন ছেড়ে দেব। আবার সংসার-আশ্রমেই ফিরে যাব। সংসারে থেকেও তো ভগবানকে ডাকা যায়। ভাবছি এবার একটা বিয়ে করে, সংসারেই ঢুকব—।

আমি আর থাকতে পাবলুম না, বলে উঠলুম—খবর্দার সাধুজী, ও কম্মো করতে যেও না। আবার সংসারে ঢুকলে একেবারে গোলকধাঁধায় পড়ে মারা যাবে বলে দিচ্ছি। যা আছ, বেশ আছ?
